সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নাদবি
ড. রাগিব সারজানি
নববি
চরিত্রের
সৌন্দর্য
জীবন যদি হতো প্রিয় নবির মতো

নববি চরিত্রের সৌন্দর্য

[জীবন যদি হতো প্রিয় নবির মতো]

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি ﷺ
ড. রাগিব সারজানি

দারুত তিবইয়ান

প্রকাশকের কথা

হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমাদের প্রিয়নবি। সাইয়িদুল মুরসালিন। বিশ্ববাসীর জন্য যিনি আদর্শ। আল্লাহ যাঁর ব্যাপারে বলেছেন; হে নবি, আপনি হলেন বিশ্ববাসীর জন্য উত্তম আদর্শ।

রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি পদে পদে আমাদের জন্য কি নেই। ঘর-সংসার, রাজা-গোলাম, ইবাদত-বন্দেগিসহ জীবনের প্রতিটি পর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য রেখে গেছেন উত্তম আদর্শের নমুনা—তাঁর নিজ আমলের মাধ্যমে।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহ ও ড. রাগিব সারজানি এ বিষয়ে নিজ নিজ গ্রন্থে সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। লেখক খুবই সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন; নবিজি সাংসারিক জীবনে কেমন ছিলেন; নবিজির দয়া-মহানুভবতা কেমন ছিল। নবিজির ইবাদত; অনুগ্রহ; নামাজ-রোজাসহ জীবনের নানা অধ্যায়ে রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কী কী আদর্শ আছে এবং তা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি লেখক এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। আশা করি বইটি আমাদের জন্য উত্তম পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। ইনশাআল্লাহ।

বইটি অনুবাদ করেছেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ও আবদুন নুর সিরাজি। আল্লাহ তাদের এ খেদমতকে কবুল করুন।

বানান সমন্বয় করেছেন তিবইয়ান সম্পাদনা পর্ষদ। আল্লাহ তাদেরও উত্তম বিনিময় দান করুন।

আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আল্লাহ মহা পবিত্র, খুঁতহীন ও সর্বৈব ত্রুটিমুক্ত। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

—প্রকাশক

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

যখন থেকে বাংলা সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক হয়েছে, তখন থেকেই চেতনার বাতিঘর হিসেবে ধারণ করছি আদিব হুজুর দামাত বারকাতুহুমকে। আর তখন থেকেই আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুল্লাহকে অন্তর থেকে ভালোবাসতে শুরু করেছি।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে অনুসরণীয় আইডল হলো নবিচরিত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যে জীবনচরিতের প্রতিটি ধাপে রয়েছে মনুষ্য জাতির পথপ্রদর্শন, অন্তরের খোরাক এবং রয়েছে পরম সুখ প্রাপ্তির বিশদ উদাহরণ।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুল্লাহর নববিচরিত নিয়ে লেখা এই গ্রন্থটির অনুবাদ করতে পেরে—সুখানুভব করছি। সাথে সাথে মহান রবের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা সাইয়িদ রহিমাহুল্লাহকে কবুল করুন এবং বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলের মুক্তির মাধ্যম করুক! আমিন।

সাথে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করছি; বইয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ড. রাগিব সারজানি রচিত এ সংক্রান্ত একটি বইয়ের কিছু অংশের অনুবাদ এ গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। সে অংশ অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় আবদুন নুর সিরাজি। আল্লাহ আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন। আমিন

—আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ
১০ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রি.

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহ তাআলার। দরুদ ও সালাম সৃষ্টির সেরা মানব, খাতিমুল আম্বিয়া হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। যার জীবনের প্রতিটি অংশে রয়েছে গোটা মানবজাতীর জন্য উত্তম নমুনা। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি প্রান্তে যে মহামানবের জীবনদর্শনকে নিজের জন্য পাথেয় করা যায় এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়—চাই তা সাংসারিক কোনো বিষয়কেন্দ্রীক হোক, কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ে হোক; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনদর্শন সকলক্ষেত্রে তাদের জন্য আলোকমিনার হবে। আর তার অনুসরণের মাধ্যমেই সঠিক পথের পথচারি পারবে, নিজের জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে।

হজরত মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুল্লাহ সিরাতবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা উম্মতের খেদমতে হাজির করেছেন, যা উম্মতের জন্য বেশ গুরুত্বপূরণ খেদমত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে 'নবীয়ে রহমত' নামক গ্রন্থটি। বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। এই বইটির শেষ অধ্যায়কে 'নববি চরিত্রের সৌন্দর্য' শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উম্মতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করে নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকে বইয়ের এই অংশটিকে পৃথক বইয়ের রূপ দেওয়া হয়েছে। যাতে করে এর দ্বারা অধিক ফায়দা অর্জন করা যায়।

—মুহাম্মাদ হামজা হাসনি নদবি
নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ
২৭ জিলহজ ১৪২৭ হিজরি

সূচিপত্র

নববি চরিত্রের সৌন্দর্য

রাসুলুল্লাহর সচ্চরিত্র, উত্তম গুণাবলি এবং সুনিপুণ দেহসৌষ্ঠব

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র, সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলি এবং অভিজাত জীবনচরিত সম্পর্কে হজরত হিন্দ বিন আবি হালাহ রাদিআল্লাহু আনহু (তিনি উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহার পুত্র এবং হজরত হাসান, হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার মামা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সুসাহিত্যিক ছিলেন) তার ভাষায় বলেন :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় আখেরাতের চিন্তা এবং আখেরাতের পরিণামের ভাবনায় নিমগ্ন থাকতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মিত অবস্থা এমন ছিল, তিনি কখনো স্বস্তিবোধ করতেন না। অধিকাংশ সময় নিরবতার মাঝে পার করতেন। একদমই অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। যখন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করতেন খুব স্পষ্ট করে মুখ খুলতেন এবং কথা বলতেন,[১] এবং সেভাবেই শেষ করতেন। তাঁর কথা, বক্তৃতা সবসময় পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং ধীরগতিতে হতো। না তাতে অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা থাকত, না তা অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে যেত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব ছিল খুবই শান্ত, এবং কথাবার্তায় ছিলেন খুবই কোমল ও নম্র। রুক্ষতা, কঠোরতা ছিল তাঁর স্বভাববিরোধী। তিনি না কাউকে তিরস্কার করতেন, আর না নিজে তিরস্কৃত হওয়া পছন্দ করতেন।[২] নেয়ামতের

[১] অর্থাৎ অহংকারিদের মতো অমনোযোগিতা কিংবা আত্মম্ভরিতা দেখিয়ে কথা বলতেন না।

[২] এখানে المهين শব্দ আনা হয়েছে। এখানকার 'মিম' অক্ষরটিকে জবর, পেশ উভয়ই পড়া যায়। পেশযোগে পড়লে অর্থ দাঁড়াবে : তিঁনি কাউকে তিরস্কার করতেন না। আর যদি জবরযোগে পড়া হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য তিরস্কার কিংবা অপদস্থতা পছন্দ করতেন না। উদ্দেশ্য এমন হবে : না তিনি কঠোর ব্যবহার করতেন, না তিনি এমন দুর্বল মননের ছিলেন- যে প্রত্যেক বিষয়কেই মেনে নিবেন। বরং তিনি কমল এবং বড়ত্বের সমুষ্ঠি ছিলেন।

পূর্ণ সম্মান করতেন এবং তার খুব খেয়াল রাখতেন—সেটা পরিমাণে যত নগন্যই হোক না কেন! কখনোই তিনি নেয়ামতের দুর্নাম করতেন না। দুনিয়া এবং দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো ঘটনা ঘটত, সেসব নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার কোনো নির্দেশ অমান্য করা হতো, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোস্বার সামনে কেউ স্থির থাকতে পারত না—যতক্ষণ না তিনি এই কাজের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য না কখনো রাগান্বিত হতেন, না কখনো তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতেন। যখন তিনি কোনোদিকে ইশারা করতেন, পুরো হাত দিয়ে ইশারা করতেন। যখন কোনো অবাক করা বিষয় বলতেন, বিস্তারিত বলতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের কব্জিকে বাম হাতের আঙুল দিয়ে ধরে রাখতেন। কটু কিংবা অমনঃপুত কথা হলে সেদিক থেকে চেহারা মোবারক ঘুরিয়ে নিতেন এবং বিমুখ হয়ে যেতেন। কখনো আনন্দিত হলে মাথা নিচু করে নিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসি অধিকাংশ সময় তাবাসসুম ছিল, হাসলে শুধু নবিজির মুক্তার ন্যায় চকচকে এবং পবিত্র দাঁত মোবারক প্রকাশ পেত।

হজরত আলি রাদিআল্লাহু আনহু, যিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের ছিলেন, যার ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার অর্জিত ছিল, যার চরিত্র, ভাবনা, দর্শন অন্য সাধারণ মানুষ থেকে উৎকৃষ্ট ছিল এবং যিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেজন্য তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি এবং ব্যবহারবিধি সবচেয়ে ভালো জানতেন। তিনি নবিজির ঐশ্বর্যপূর্ণ চরিত্র সম্পর্কে বলতেন—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় নোংরা কথাবার্তা, নির্লজ্জতা এবং বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকতেন। ঘটনাক্রমেও এমন কোনো কথা কিংবা কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হতো না। কিছু ক্রয় করার সময় কখনোই তাঁর আওয়াজ উঁচু করতেন না। খারাপ কাজের শোধ কখনোই খারাপ কিছু দিয়ে নিতেন না, বরং ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তা সমাধা করতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কারো ওপর হাত তুলেননি, কেবল তখনই হাত তুলতেন—যখন যুদ্ধের ময়দানে কেউ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে লড়তে আসত। স্ত্রী কিংবা গোলামের ওপর কখনোই হাত তুলতেন না। আমি কখনোই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ওপর করা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে দেখিনি—যতক্ষণ না কেউ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত গণ্ডির বাহিরে চলে যায়, অথবা মহিয়ানের ইজ্জত সম্মানে বিন্দুমাত্র আঁচড় ফেলে। হ্যাঁ, কেউ যদি আল্লাহ তাআলার কোনো নির্দেশকে

অবমূল্যায়ন করে। কিংবা আল্লাহ তাআলার সম্মানে বিন্দুমাত্র আঁচ আনার চেষ্টা করে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে অধিক রাগান্বিত কেউ হতো না। যখন দুটি বিষয় থাকত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনামূলক সহজ বিষয়টিকেই গ্রহণ করতেন। যখন তিনি নিজ আবাসস্থলে আগমন করতেন, একদম সাধারণ মানুষের মতো থাকতেন। নিজের কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের সমস্ত প্রয়োজন নিজেই পূরণ করতেন।

সবসময় নিজের জিহ্বা মোবারক নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। কেবল সে কথাই বলতেন, যার মাধ্যমে কোনো উপকার পাওয়া যায়। সকলের মন রক্ষা করে চলতেন, কখনো কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন না। কোনো গোত্র কিংবা বংশের সম্মানিত ব্যক্তি আসলে তাদের সাথে খুব সম্মান এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতেন, তাদেরকে ভালো এবং উত্তম কাজে একতাবদ্ধ হতে উৎসাহিত করতেন, অনুগতদের বিষয়ে সতর্ক থাকার হুঁশিয়ারি করতেন। তিনি নিজের সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও উত্তম ব্যবহার থেকে কাউকে নিরাশ না করার আদেশ করতেন। তিনি নিজ পরিবার-পরিজনের নিয়মিত খবর রাখতেন। লোকেদের কাছে তাদের হাল-হাকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।

ভালো কাজের ব্যাপারে ভালো বলতেন এবং সেটাকে শক্তিশালী করতেন। খারাপ কাজকে খারাপ বলতেন এবং তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লেনদেন সংযত এবং এক ধারায় ছিল। তিনি কখনো কোনো বিষয় থেকে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে যেতেন না। ভয় করতেন অন্য লোকেরাও যাতে গাফেল হয়ে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ে। প্রত্যেক অবস্থায়, যেকোনো জায়গার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রয়োজন অনুপাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিদ্যমান থাকত। তিনি না কারো প্রাপ্য আদায়ে সংকীর্ণ মনোভাব রাখতেন, না সীমাতিরিক্ত দিয়ে দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী তারাই হতো—যারা সবার মধ্যে উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হতো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয় তারা হতো, যারা সকলের ভালো চাইত এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করত। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত সে ব্যক্তি ছিল-যে সহানুভব, ধৈর্য, পরোপকার এবং অন্যের সহযোগিতায় সবচেয়ে অধিক ভূমিকা রাখত। তিনি আল্লাহর নাম জপতে জপতে দাঁড়াতেন এবং জপতে জপতেই বসতেন। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও আগমন করতেন, মজলিসের যেখানে জায়গা খালি পেতেন, সেখানেই বসে যেতেন এবং অন্যদেরও এই আদেশ করতেন। তিনি নিজ মজলিসে সকলকে (মনোযোগ এবং একাগ্রতার বিষয়ে) সমপরিমাণ অংশ দিতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে উপস্থিত সকল শ্রোতা ভাবত, তার থেকে অধিক মনোনিবেশ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কারো প্রতি করেননি। যদি কোনো ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে কোনো কারণে বসতে বলত কিংবা কোনো প্রয়োজনে তাঁর সাথে কথা বলতে চাইত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদম শান্ত এবং নিবিড় হয়ে তার পূর্ণ কথা শুনতেন—যতক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজের কথা শেষ করে চুপ হয়ে যেতেন। যদি কোনো ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু চাইত বা সাহায্যপ্রার্থনা করত, তবে তার প্রয়োজন পূরণের পূর্বে তিনি ফিরতেন না, অথবা কমপক্ষে নরম ও মিষ্ঠ ভাষায় তাকে সন্তুষ্টির জবাব দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম ব্যবহার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের দায়িত্ববান পিতা বনে গিয়েছিলেন। আর সকল মানুষের দায়িত্ব পালনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো তফাৎ করেননি, বরং তাঁর কাছে সবার প্রাপ্তি বরাবর হতো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস ইলম, আধ্যাত্মিকতা, লজ্জা, শরম, ধৈর্য, আমানতদারির মজলিস ছিল। না সেখানে কেউ তার কণ্ঠ উঁচু করত, না সেখানে কারো দোষচর্চা হতো। না কারো সম্মান কিংবা আত্মমর্যাদায় আঘাত করা হতো, না কারো অপারগতার ওপর ভর্ৎসনা করা হতো। সবাই একে অপরের সমমূল্যায়ণ পেত। শুধুমাত্র খোদাভীতির ওপর ভিত্তি করেই একের ওপর অপরের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। নবিজির মজলিসে ছোটরা বড়দের সম্মান করত, বড়রা ছোটদের স্নেহ এবং ভালোবাসায় আগলে রাখত। সেখানে অভাবগ্রস্তকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হতো। বিদেশী ও পথিকদের দেখভাল করা হতো এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষার কড়া নির্দেশ থাকত।

হজরত আলি রাদিআল্লাহু আনহু আরও বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও সজীব হাস্যবদনে থাকতেন। তিনি খুবই শান্ত চরিত্রের এবং নরম মনের অধিকারি ছিলেন।[৩] না কঠিন মেজাজের ছিলেন, না কঠিন ভাষা ব্যবহার করতেন। আওয়াজ উঁচু করে কথা বলতেন না, বেহুদা ও অপ্রয়োজনীয় কথাও বলতেন না। না কারো ওপর দোষ চাপাতেন, আর না সংকীর্ণ মনের অধিকারী ছিলেন। যে কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দ না হতো তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন (অর্থাৎ তা থেকে নিবৃত্ত থাকতেন এবং কোনো কথা বলতেন না)। তবে সরাসরি বিমুখ ভাব প্রকাশ করতেন না, কোনো জবাবও দিতেন না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি কাজ থেকে নিজেকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতেন—

ক. কারো দোষচর্চা করতেন না।

---

[৩] অর্থাৎ খুব দ্রুতই দয়ালু হয়ে যেতেন। অনেক বেশি মেহেরবান এবং দয়াময় ছিলেন। খুব দ্রুত এবং খুব সহজেই মাফ করে দিতেন। এখানের আরেকটি উদ্দেশ্য এটাও হয়, তিনি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। একটি মত এমনও পাওয়া যায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য শান্ত, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং খুশু-খুজু।

খ. কারো ওপর অন্যায় দোষ চাপাতেন না।

গ. কারো দুর্বলতা কিংবা গোপন কাজের পিছনে লাগতেন না।

তিনি শুধু সেসব কথাই বলতেন, যার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার আশংকা করতেন। যখন তিনি কথা বলতেন মজলিসে উপস্থিত সকল ব্যক্তি তাদের মাথা এভাবে নামিয়ে নিতেন, মনে হতো তাদের মাথার ওপর কোনো পাখি অবস্থান করছে।[৪] যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে শেষ করতেন, তখন তারা কথা বলত। কখনো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উচ্চ আওয়াজে কথা বলত না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যদি কোনো ব্যক্তি কথা বলত, বাকিরা খামুশ হয়ে তার কথা শুনত—যতক্ষণ না তার বলা শেষ হতো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুত্ব সে পরিমাণ হতো, তার আগের ব্যক্তির যে পরিমাণ মূল্যায়ণ করা হতো (অর্থাৎ পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে তার কথা বলার সুযোগ থাকত, এবং পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনা হতো)।

যে কথায় সবাই হাসত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সে কথায় হাসতেন। যে বিষয়ে সবাই আশ্চর্যবোধ করত, তিনিও সে কথায় আশ্চর্যবোধ প্রকাশ করতেন। মুসাফির এবং বিদেশীদের ভিন্ন চোখে দেখতেন না, তাদের সবধরনের কথা শুনতেন অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে—যতক্ষণ না কোনো সাহাবি হজরত এমন লোককে নিজের দিকে আকর্ষিত করত (যাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর পীড়াদায়ক না হয়)।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'যদি কোনো দুর্দশাগ্রস্ত তোমার সামনে আসে, তবে তাকে সাহায্য করো!' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতাই শুনতেন, যারা সে বিষয়ে সীমাতিক্রম করত না। কারো কথা বলার মাঝখানে তিনি কথা বলতেন না এবং কারো কথাকে মাঝখানে থামিয়ে দিতেন না। হ্যাঁ, যদি কেউ সীমা পার করে ফেলত, তবে তাকে চুপ হয়ে যেতে বলতেন কিংবা স্বয়ং সে মজলিস থেকে উঠে যেতেন—যাতে সে লোক কথা সমাপ্ত করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার থেকে প্রশস্ত দিল, উদার মনোভাব, মিষ্টভাষী এবং দয়ালু চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। লেনদেনের ব্যাপারে খুবই সতর্ক এবং আমানতদারিতে সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথমবার দেখত, সে ভীত হয়ে পড়ত। যখন তাঁর সান্নিধ্যে থাকত, তাঁর বিষয়ে জানাশোনা বাড়ত, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী

[৪] অর্থাৎ বিলকুল নাড়াচাড়া করতেন না, নাড়ালে হয়তো মাথার উপর থেকে পাখি উঁড়ে যাবে।

এবং শুভাকাঙ্ক্ষিতে পরিণত হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্যপ্রাপ্তরা বলতেন, 'না, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে দেখেছি, না নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এমন কাউকে দেখেছি।'[৫]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে পরিপূর্ণতার সজ্জায় সজ্জিত করেছেন এবং দয়া ও ভালোবাসার সৌন্দর্যে অলঙ্কিত করেছেন। হজরত হিন্দ বিন আবি হালাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মপ্রত্যয়, গাম্ভীর্য এবং শান ও শওকতের বাহক ছিলেন। অন্য সাধারণের নিকটও অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা চৌদ্দ তারিখ রাতের চাঁদের চেয়েও অধিক চমকদার ছিল।[৬]

হজরত বারা বিন আ'জিব রাদিআল্লাহু আনহু বলতে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝারি গড়নের ছিলেন। আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাল আলখেল্লা পরিহিত দেখেছিলাম। এর থেকে সুন্দর কোনো কিছু আমি আর কখনো দেখিনি।[৭]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলতে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝারি গড়নের ছিলেন, প্রায় দীর্ঘকায়। গাত্র ছিল অত্যন্ত গৌরবর্ণের, দাড়ি মোবারকের চুল ছিল কালো, মুখাবয়ব ছিল অত্যন্ত সুন্দর, ভ্রূযুগল ছিল দীর্ঘ। বর্ণনার শেষদিকে বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে কিংবা পরে তাঁর অনুরূপ কাউকে দেখিনি।[৮]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলে—আমি রেশম এবং রেশমের কাপড়কেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্ত মোবারকের চেয়ে মোলায়েম পাইনি। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুগন্ধির সমতুল্য কোনো সুগন্ধিও পাইনি।[৯]

---

[৫] শামায়েলে তিরমিজি।

[৬] হজর
ত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে হিন্দ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন (শামায়েলে তিরমিজি)।

[৭] বোখারী, মুসলিম।

[৮] বোখারী শরিফ, আল আদাবুল মুফরাদ, 'নবি সা. কারো দিকে ফিরলে পূর্ণ ফিরতেন' অনুচ্ছেদ।

[৯] বোখারী, মুসলিম।

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রেসালাত এবং তার প্রিয়দের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তথাপিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে এবং সব থেকে মনোযোগী ছিলেন।

হজরত মুগিরা বিন শু'বা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজে (নফল) এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন যে, তার কদম মোবারকে যখম হয়ে গেল। বলা হলো আপনার তো আগে পরের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। এটা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?[১০]

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআন শরিফের এক আয়াত পড়তে পড়তে গোটা রাত পার করে দিতেন।[১১]

হজরত আবু জর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নামাজে দাঁড়ালেন এবং এক আয়াতের মাধ্যমে সকাল হয়ে গেল। আয়াতটি এই ছিল—

إِن تُعَذِّبهُم فَإِنَّهُم عِبَادُکَ وَإِن تَغفِر لَهُم فَإِنَّکَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيم

> অর্থ : যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দিন, তবে তারা তো আপনারই দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রমশালী মহা জ্ঞানী। [সূরা মায়েদাহ : ১১৮][১২]

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোজা রাখতেন, রোজা রাখার আধিক্য দেখে আমরা বলতাম, এখন থেকে আপনি হয়তো প্রতিদিনই রোজা থাকবেন। আর যখন রোজা রাখা বন্ধ করতেন, আমরা ভাবতাম তিঁনি আর রোজাই রাখবেন না।[১৩]

---

[১০] এই বর্ণনাটি ইমাম বোখারি রহিমাহুল্লাহ সূরা ফাতহের তাফসিরে, ইমাম মুসলিম, তিরমিজি এবং নাসায়ি রহিমাহুল্লাহ 'আহয়াউল-লাইল' অধ্যায়ে বয়ান করেছেন।

[১১] তিরমিজি।

[১২ নাসায়ি রহিমাহুল্লাহ 'তারদিয়াতুল আয়াহ' অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ রহিমাহুল্লাহ 'মা-জা-আ ফিল-কোরআনি বিল-লাইল' অধ্যায়ে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[১৩] এইসব কথা নফল রোজার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যদি কোনো ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতে নামাজরত দেখতে চাইত, তবে তাই পেত। আর কেউ যদি তাকে শয়ন অবস্থায় দেখতে চাইত, তবে সেভাবেই দেখতে পারত।[১৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনুশ শাখির রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলাম, আমি দেখলাম তিঁনি নামাজরত আছেন এবং কান্নার প্রকোপে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ মোবারক থেকে এমন আওয়াজ বের হচ্ছে, যেন তাঁর হেঁচকি উঠে যাচ্ছে।[১৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ ছাড়া অন্যকিছুতে প্রফুল্ল হতেন না। নামাজের পরও বুঝা যেত, তিঁনি নামাজের দিকেই আগ্রহী ও উৎসাহী আছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আমার চোখ শীতল হয় নামাজের মাধ্যমেই।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমের বক্তব্য এমন : যখন কোনো সমস্যার বিষয় সামনে আসত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ নামাজের পাবন্দ হয়ে যেতেন।[১৬]

হজরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন কখনো রাতে ঝড়-তুফান আরম্ভ হতো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে অবস্থান নিতেন, যতক্ষণ না ঝড়ো-হওয়া থেমে যেত। যদি কোনো আসমানি পরিবর্তন- সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা ঘটত, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজে ছুটে যেতেন এবং গ্রহণ শেষ হয়ে আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত এর থেকে পানাহের দুআ করতেন।[১৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় নামাজের জন্য উৎসাহী থাকতেন এবং আদায় ব্যতি রেখে প্রশান্তি অনুভব করতেন না। যতক্ষণ নামাজ আদায় না করে থাকতেন—আফসোস ও অশান্তির মধ্যে সময় কাটাতেন।

একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মুআজ্জিন হজরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন : বেলাল, নামাজের পাবন্দি করো, এবং অন্তরের স্বস্তি অর্জন করো।[১৮]

---

[১৪] সহীহুল বোখারি, 'কিয়ামুন নাবিয়্যি ওয়া নাওমিহি' অধ্যায়।
[১৫] শামায়েলে তিরমিজি।
[১৬] আবু দাউদ।
[১৭] তিবরানি।
[১৮] আবু দাউদ।

নবিজির দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থান এবং তার প্রতি অনীহা

দিনার, দেরহাম এবং দুনিয়ার মাল সম্পদ ও ঐশ্বর্যের সাথে নবিজির সম্পর্ক এমন ছিল যে, অর্থ সম্পদের বড় থেকে বড় স্তূপ, উচ্চ পর্যায়ের বাক্য, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে অবস্থান তৈরির কোনো যোগ্যতা রাখত না। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমানি, রুহানি দরসগাহে উপবিষ্ট ছাত্ররা—আরব অনারবে অবস্থানরত তার অনুসারী এবং শুভাকাঙ্ক্ষিরাও দিনার দেরহামকে মূল্যহীন টুকরোর চেয়ে অধিক মূল্যায়ন করেন না। তাদের দরবেশী জীবনযাপন, দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি অনীহা, অন্যের প্রয়োজনে নিজ সম্পদ ব্যয়ের প্রবণতা এবং অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা, শত্রুর সাথে নম্র ব্যবহার, একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য না দেওয়ার ঐতিহাসিক প্রামাণিক ঘটনাপুঞ্জি মনুষ্য মস্তিষ্ককে দ্বিধায় ফেলে দেয়।[১৯]

যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারিদের অনুসারির এই হাল, সেখানে অনুমান করা যাক, স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- যিনি এই দুনিয়াবিমূখ দলের প্রধান, ইমাম, পথপ্রদর্শক ও প্রত্যেক ভালো, স্বচ্ছ, উত্তম কাজে তাদের নেতা—সেই মহান ব্যক্তির অবস্থান কেমন হবে এ বিষয়ে—তা কি আর বলার প্রয়োজন রাখে?

আর সেজন্য আমরা এই বিষয়ে কেবল সেসকল কথাগুলোই তুলে ধরব, যা সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমের জবান হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। কেননা

---

[১৯] এই বিষয়ের ওপর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের জন্য আবদুল্লাহ বিন মোবারক রহিমাহুল্লাহুর 'কিতাবুল জুহদ' গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী হবে।

ঘটনার চেয়ে অধিক বাস্তবসম্মত আর কিছু নেই এবং এরচেয়ে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয় হতেও পারে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ প্রভাবান্বিত উক্তি, যে উক্তির প্রতিটি অক্ষর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ আদায় করে চলেছেন, এবং যেটাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনের মূলপাঠ ও মেরুদণ্ড হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। সেটা হলো—

اَللّٰهُمَّ لا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَة

হে আল্লাহ, মুল জীবন তো আখেরাতের জীবন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন—

مالى وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها

দুনিয়ার সাথে আমার কীসের সম্পর্ক! দুনিয়ার সাথে তো আমার এতটুকু সময়ের সম্পর্ক, যেমন কোনো মুসাফির চলার পথে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অবস্থান করে পুনরায় নিজ পথে চলতে শুরু করে—ছায়াকে উপেক্ষা করে।

হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চাটাইয়ের ওপর শয়নরত দেখলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠে চাটাইয়ের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। এই দৃশ্য অবলোকন করে উমর রাদিআল্লাহু আনহুর চোখ ভিজে উঠল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' উমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ। অথচ আরাম আয়েশ করছে কেসরা-কায়সার!' এটা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল, এবং তিনি বললেন, 'ইবনে খাত্তাব, তোমার কোনো সন্দেহ আছে?' পুনরায় তিনি বললেন, 'তাদের (কেসরা-কায়সার) দুনিয়ার জীবনে সকল সাধ পূরণ করে দেওয়া হচ্ছে।'[২০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রকার জীবনোপায় ও মাপকাঠি শুধু নিজের জন্যই অপছন্দ করতেন না, বরং আহলে বায়তের জন্যও এমন জীবনোপায়কে স্বাচ্ছন্দযোগ্য ভাবতেন না। সেজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجعل رزق ال محمدا قوتا

[২০] হাদিসটির মূল ভাষ্য বোখারি এবং মুসলিমে রয়েছে।

হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের বংশধরদের রিজিক, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দিন![২১]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন : কসম সে সত্তার, যার হাতে আবু হুরাইরার জীবন, আল্লাহ তাআলার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবার কখনো লাগাতার তিনবেলা পেট ভরে গমের রুটি খেতে পারেননি—দুনিয়াকে বিদায় জানানোর পূর্ব পর্যন্ত।[২২]

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : আমরা আহলে বায়তরা এক চাঁদ পার করে পরবর্তী চাঁদ মাসে পৌঁছে যেতাম, কিন্তু আমাদের চুলায় আগুন ধরত না। শুধু খেজুর ও পানি আমাদের জীবনধারণের উৎস হতো।[২৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল, এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এমন ছিল না যে—তা ফেরত আনবে। আর এ অবস্থাতেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।[২৪]

বিদায় হজের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর বিস্তৃতি ছিল। গোটা আরবজাহান নবিজির সীলমোহরে আবদ্ধ ছিল। সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এমন ছিল, তিনি নিম্নমানের একটি হাওদায় আরোহিত ছিলেন। গায়ে একটি চাদর জড়ানো ছিল মাত্র, যার মূল্য চার দিরহামের বেশি ছিল না। সে-সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ এমন হজ পালনের তাওফিক দাও, যার মাঝে কোনো অহংকার বা খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি না হয়।[২৫]

হজরত আবু জর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- আমার আকাঙ্ক্ষা নেই যে, আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকে এবং তিনদিন অতিক্রান্ত হয়- তার মধ্য থেকে একটি দিনারও আমার কাছে বাকি থাকবে—শুধুমাত্র দীনি কোনো কাজের জন্য অল্পকিছু বাকি রাখা ছাড়া, অন্যথায় সব স্বর্ণ আমি আল্লাহর বান্দাদের এভাবে এভাবে বিলাতাম, তাদের আগেপিছে, ডানে-বামে তা লুটিয়ে পড়ত।[২৬]

---

[২১] সহিহুল বোখারি, সহিহুল মুসলিম।
[২২] বোখারি, আহমাদ, সহিহুল মুসলিম : কিতাবুল জুহদ।
[২৩] বোখারি, মুসলিম।
[২৪] তিরমিজি
[২৫] হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, শামায়েলে তিরমিজি।
[২৬] বোখারি, মুসলিম।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : কখনো এমন হয়নি যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো জিনিসের প্রার্থনা করা হয়েছে, আর তিঁনি এর জবাবে কিছুই বলেননি।[২৭]

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- দান, উদারতা, বদান্যতা প্রকাশে ঝড়ো হওয়ার চেয়েও দ্রুতগামী ছিলেন।[২৮]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, একবার এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু প্রার্থনা করল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বকরি এবং ভেড়ার পাল দান করে দিলেন—যা পাহাড়ে চড়ানো অবস্থায় ছিল। সেসব বকরি নিয়ে লোকটি নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গেল এবং বলতে শুরু করল, 'হে আমার সম্প্রদায়, ইসলাম গ্রহণ করে নাও! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে দান করছেন- যেন তার দারিদ্রতা এবং ক্ষুদপিপাসার কোনো ভয়ই নেই। একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে ন'হাজার দেরহাম হাদিয়া আসল। দেরহামগুলোকে একটি চাটাইয়ের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সেগুলোকে ভাগ করতে শুরু করলেন এবং কোনো প্রার্থনাকারীকেই ফিরিয়ে দিলেন না—যতক্ষণ না সেগুলো শেষ হয়ে গেল।

---

[২৭] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল আদব।

[২৮] হাদিসের পূর্ণ অংশ বোখারি এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

সৃষ্টিজীবের সাথে নবিজির আচরণ

সেই সুখময় ইবাদাত, যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার আসবাবের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। পূর্ণাঙ্গীন আল্লাহভীতি, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং তার দরবারে রোনাজারি ও দুআ-মোনাজাতের মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাস্যময় ললাট, উত্তম চরিত্র, দয়া, ভালোবাসা, দিলদারি এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য অধিকার আদায়, এবং সকলের অবস্থান অনুপাতে সম্মান প্রদর্শন করার মাঝে কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হতো না। আর এগুলোকে তিঁনি এমনভাবে বাস্তবায়ন করতেন, যা অন্য কোনো মানুষের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا

> যা আমি জানি, যদি তা তোমরা জানতে, তবে কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।[২৯]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে প্রশস্ত মন, নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। বংশগতভাবে ছিলেন সব থেকে সম্মানি বংশের। নিজ সঙ্গী-সাথীদের থেকে পৃথক থাকতেন না, বরং তাদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন, তাদের সন্তানাদিদের সাথে হাসি মজাক করতেন, বাচ্চাদের কোলে তুলে নিতেন। গোলাম, আজাদ, বাঁদি, দরিদ্র, সকলের ডাকে সাড়া দিতেন। অসুস্থদের দেখতে যেতেন, চাই সে শহরের অপর প্রান্তেই হোক না কেন! প্রয়োজনগ্রস্তের প্রয়োজন মেটাতেন।[৩০] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে পা বিছিয়ে বসতে দেখা যায়নি—যাতে করে এর মাধ্যমে কারো কোনো সমস্যা কিংবা অস্বস্তি অনুভূত না হয়।

---

[২৯] বোখারি, মুসলিম।
[৩০] আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত (রেওয়ায়েতে আবু নাঈম, আল হিলয়াহ)

হজরত আবদুল্লাহ বিন হারেস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক হাস্যোজ্জল আর কাউকে দেখিনি।[৩১] হজরত জাবের বিন সামুরাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার শ'য়ের অধিক বার বসার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি একবার দেখলাম সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনাচ্ছেন, জাহেলী যুগের ঘটনাবলির স্মৃতিচারণ করছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ শুনছেন, মাঝে কখনো হাসির কথা আসলে মুচকি হাসছেন।

হজরত শুরাইদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উমাইয়া বিন সালতের কবিতা শুনানোর আদেশ করলেন, সুতরাং আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার কবিতা পড়ে শুনালাম।[৩২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত নরম মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। দয়া ও ভালোবাসার মূর্তমান প্রতিক ছিলেন। মনুষ্য অনুভূতি ও উত্তম চরিত্রের নমুনা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতে সুন্দর ও সর্বোৎকৃষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়। হজরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কন্যা হজরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহাকে বলতেন- আমার উভয় পুত্রকে (হাসান, হুসাইন রা.) ডাকো, তারা দৌড়ে আসত। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গালের সাথে লাগাতেন তারপর তাঁদের বুকের সাথে জড়িয়ে নিতেন।[৩৩] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার নিজ দৌহিত্র হজরত হাসান বিন আলি রাদিআল্লাহু আনহুকে ডাকলেন, তিঁনি দৌড়ে আসলেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে উঠে বসলেন। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়িতে আঙুল দিয়ে খেলতে লাগলেন। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মুখ খুলে দিলেন এবং হাসান রাদিআল্লাহু আনহু নবিজির মুখে নিজের মুখ প্রবেশ করালেন।[৩৪]

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন : জায়েদ বিন হারিসাহ রাদিআল্লাহু আনহু (যিনি নবিজির গোলাম ছিলেন) মদিনায় এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আগমন করলেন। তিঁনি দরজায় এসে হাঁক দিলেন, তার আওয়াজ শুনে ততক্ষণাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। তিঁনি সে সময়

---

[৩১] শামায়েলে তিরমিজি।
[৩২] বোখারি, আদাবুল মুফরাদ।
[৩৩] তিরমিজি।
[৩৪] বোখারী, আদাবুল মুফরাদ।

পুরোপুরি বস্ত্রাবৃত ছিলেন না। শরীর থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছিল, এটা লক্ষ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআনাকা করলেন এবং চুমু খেলেন।[৩৫]

হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যা এসে তাঁকে খবর দিল, আমার সন্তান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। আপনি এখনই সেখানে আসুন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সালাম জানালেন এবং বললেন, আল্লাহর জন্য যা, তা আল্লাহ আল্লাহ তাআলা নিয়ে নিবেন। আর তার জন্য তা-ই, যা তিনি দান করেছেন। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সে মহান সত্তার কাছে লিখিত ও নির্ধারিত আছে। সেজন্য উচিত ধৈর্যধারণ করা, এবং এর বিনিময়ে সওয়াবের নিয়ত ও আকাঙ্ক্ষা রাখা। তথাপিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কসম দিয়ে বললেন, আপনি অবশ্যই আগমন করুন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, আমরাও তার সাথে দাঁড়ালাম। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাশরিফ আনলেন, বাচ্চাটিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাটিকে হাতে তুলে নিলেন। তখন বাচ্চাটির শ্বাস ফুরিয়ে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করল। হজরত সাদ রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ, এটা কী? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর রহমত- যা তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশি তার অন্তরে ঢেলে দেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়ালু বান্দার ওপরই দয়া করেন।[৩৬]

যখন বদরের যুদ্ধবন্দিদের সাথে হজরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং তার আহাজারি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে আসছিল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমোতে পারছিলেন না। যখন আনসারি সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম এ বিষয়ে অবগত হলেন, আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর বাঁধন খুলে দিলেন। আনসার সাহাবায়ে কেরামের এই মহানুভবতা, দয়ার্দ্রতা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এজন্য স্বস্তি দিচ্ছিল না—কেননা তা আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এবং অন্য বন্দিদের মাঝে পার্থক্য তৈরি করছিল। আনসার সাহাবায়ে কেরাম ভাবলেন, আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর বাঁধন ঢিলা করে দেওয়ায় নবিজি খুশি হয়েছেন, আর তাই হজরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর মুক্তিপণ মাফ করতে চাইলেন—যাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও খুশি হয়ে যান। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অস্বীকার করলেন।[৩৭]

---

[৩৫] তিরমিজি

[৩৬] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল মারদ্বো।

[৩৭] ফাতহুল বারী ৮/৩২৪ (মিশরি সংস্করণ)।

এক গাম্য লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি আপনাদের সন্তানদের ভালোবাসেন? আমরা তো তাদের ভালোবাসি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তর থেকে দয়া বের করে নেন, তবে আমার কী করার আছে?[৩৮]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদের প্রতি অনেক বেশি দয়ালু ছিলেন এবং তাদের সাথে অনেক নরম ও আদরের সম্পর্ক রাখতেন। হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : খেলায় মত্ত কিছু বাচ্চা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সালাম দিলেন।[৩৯]

হজরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে গলা মেলাচ্ছিলেন, আমার এক ছোট ভাইকে দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- নাগায়ের,[৪০] কী হয়েছে?[৪১]

মুসলমানদের প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বন্ধুসুলভ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁদের অবস্থার পূর্ণ দেখভাল করতেন। মনুষ্য প্রবৃত্তিতে একঘেয়েমি ও সাময়িকভাবে দুর্বল অভিপ্রায় তেরি হয়—সেদিকেও তিনি পূর্ণ খেয়াল রাখতেন।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাদের প্রতি ওয়াজ নসিহত করতেন, তা খুব ধীরগতিতে থেমে থেমে করতেন, যাতে আমাদের মাঝে একঘেয়েমি ভাব তৈরি না হয়। নামাজের সাথে এতটা গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও নামাজের মাঝে কোনো বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনলে, তিনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেন যে, আমি নামাজের জন্য দাঁড়াই এবং নিয়ত করি নামাজকে খুব দীর্ঘ করতে। সে অবস্থায় কোনো বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনলে নামাজকে সংক্ষেপ করে দিই, যাতে মায়ের সমস্যা কিংবা কষ্টের কারণ না হয়।[৪২]

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ সা., আল্লাহর কসম, আমি (নিজ মহল্লায়) ফজরের নামাজে মসজিদে উপস্থিত হই না, শুধুমাত্র অমুক ইমাম নামাজ দীর্ঘ করে বলে। এটা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিমাণ রাগান্বিত হয়ে নসিহত করলেন, আমি অন্য কোনো সময় তা দেখিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের

---

[৩৮] আয়শা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। সহিহুল বোখারী।
[৩৯] সহিহুল বোখারী, কিতাবুল ইসতি'যান।
[৪০] ক্ষুদ্র পাখি, বাচ্চারা খেলা করে।
[৪১] আল আদাবুল মুফরাদ পৃষ্ঠা/৪০।
[৪২] সহিহুল বোখারি, কিতাবুস সালাহ।

মধ্যে সে লোক আছে, যে মানুষকে (নামাজের প্রতি) বিষণ্ণ করে তুলে। তোমাদের মধ্যে যে নামাজে ইমামতি করবে, তার জন্য উচিত- নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা। কেননা নামাজে কমজোর লোকেরাও অংশ নেয়—বৃদ্ধ এবং প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তিও।[৪৩]

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে এই ঘটনাও এসে যায় : হজরত আনজাশা রাদিআল্লাহু আনহু, যিনি মহিলা কাফেলার উষ্ট্রচালক ছিলেন। অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তার সুমধুর আওয়াজে উটনি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেত। সেকারণে মহিলাদের কষ্ট হতো। এটা লক্ষ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আনজাশা রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, একটু ধীরগতিতে উট হাকাও, যাতে এই দ্রুততার কারণে কাচপাত্র (কমজোর, দুর্বল আরোহী) সদৃশ্য কারো কষ্ট না হয়। [৪৪]

আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ মোবারককে বিদ্বেষ এবং কারো খারাপ কিছু চাওয়া থেকে পবিত্র রেখেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো বদগুমানি না করে। কেননা আমি চাই, যখন তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত হব, তখন যেন আমার অন্তর পূর্ণ পরিষ্কার থাকে।[৪৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের ব্যাপারে দয়ালু পিতার মতো ছিলেন। সমস্ত মুসলিম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এভাবে থাকতেন—যেন তারা নবিজির পরিবার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর তাদের দায়িত্ব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ন্যস্ত। তাদের প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া এবং এমন প্রেমময় সম্পর্ক ছিল, যেমন কোলের বাচ্চার সাথে জন্মদাত্রী মায়ের সম্পর্ক হয়। মুসলমানদের দৌলত-সম্পদ এবং রিজিকের মধ্যে যে উন্নতি আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন, তার মাধ্যমে তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো উপকার ছিল না। কিন্তু তাদের ঋণের বোঝা হালকা করার দায়িত্ব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিঁনি বলতেন, যে সম্পত্তি ফেলে গেছে, তা তার সন্তানের মালিকানাধীন, আর যে ঋণ ইত্যাদি রেখে গিয়েছে, তা আদায় করা আমাদের দায়িত্বাধীন।[৪৬]

অন্য এক বর্ণনায় এমন পাওয়া যায় : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন কোনো মুমিন নেই, দুনিয়া আখেরাতে যার আমার চেয়ে অধিক দায়ত্বিশীল কেউ আছে। যদি চাও এই আয়াত পড়ো—

---

[৪৩] সহিহুল বোখারি, কিতাবুস সালাহ।
[৪৪] আল আদাবুল মুফরাদ পৃষ্ঠা ১৮৫, সহিহুল বোখারি, সহিহুল মুসলিম।
[৪৫] কিতাবুশ শুফা, পৃষ্ঠা ৫৫, আবু দাউদের বর্ণনায়।
[৪৬] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল ইসতিবরাজ।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

নবি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুপ্রতিম। [সূরা আহজাব : ০৬]

এজন্য যে মুমিন মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার সম্পদ ছেড়ে গেছে, তবে সেটা তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর অধিকার—সে সম্পদ যাই হোক না কেন! আর যদি মৃতব্যক্তির জিম্মায় কোনো ঋণ অথবা এমন কোনো সম্পত্তি থেকে যায়- যা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে আমার নিকট আসো, তা রক্ষার দায়িত্বশীল আমি হব।[৪৭]

[৪৭] সহিহুল বোখার, কিতাবুল ইসতিখরাজ।

সমতা বিধান ও চারিত্রিক ভারসাম্য

আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উচ্চমাপের চরিত্র এবং প্রকৃতিগত ঐশ্বর্য দানে ধন্য করেছেন—যাতে আগত সকল শতাব্দি, বর্তমান-ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তা পরিপূর্ণতার মাধ্যম হয় এবং সেখান থেকেই সমতা বিধান, চারিত্রিক ভারসাম্য, নমনীয় উপলব্ধি, ভারসাম্য রক্ষা, গ্রহণযোগ্যতা, প্রাচুর্য ও অলসতা থেকে বাঁচার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন দুটি বিষয়ের মাঝে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হতো, তবে তিনি সেটাকেই গ্রহণ করতেন, যা তুলনামূলক সহজ অনুভূত হয়—অবশ্য তা গুনাহের ঘ্রাণ থেকেও মুক্ত হতে হবে। আর যদি তাতে গুনাহের আভাসমাত্রও পাওয়া যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতেন।[৪৮]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লৌকিকতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়াবিমূখতা, দরবেশী জীবনযাপন এবং আত্মার প্রশান্তির জায়েজ মাধ্যম থেকে মুখফিরিয়ে নেওয়াকে অপছন্দ করতেন। হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- দীন সহজ, আর যে দীনের সাথে শক্তি পরীক্ষা করবে—দীন তার ওপর বিজয়ী হবে। এজন্য মধ্যমপন্থা এবং ভারসাম্য রক্ষা করে চলো এবং এর নিকটবর্তী থাকো, আশা রাখো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো![৪৯]

এছাড়াও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : দাঁড়াও, ততটুকুই করো, যতটুকু করার সাধ্য তোমার মধ্যে আছে, এজন্য যে- আল্লাহর কসম, তিনি কখনো ক্লান্ত

---

[৪৮] সহিহুল মুসলিম।
[৪৯] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল ইমান।

হবেন না, তুমিই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট কোন দীন সবচেয়ে প্রিয়? তিঁনি বললেন, সহজ ও সরল দীনে ইবরাহীমি।[৫০]

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : অতিরিক্ত ও কঠিন করা, চুলের চামড়া বের করা ব্যক্তি ধ্বংস হোক![৫১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমকে এক জায়গায় শিক্ষা এবং ওয়াজ-নসিহতদানে প্রেরণ করবেন। তখন তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন- সহজবোধ্য হও, সঙ্কীর্ণতা বেছে নিও না। সুসংবাদ দিও, হতাশ করো না! হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন—তার নেয়ামতের নিদর্শন তার বান্দার মাঝে দেখতে।[৫২]

[৫০] আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ১৮১।

[৫১] সহিহুল মুসলিস। অর্থাৎ দীনের বিষয়ে প্রতারণা করা এবং তার মাঝে অতিরিক্ত করা ব্যক্তিরা।

[৫২] তিরমিজি শরিফে এই হাদিসটি আবওয়াবুল আদবে আনা হয়েছে।

ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عب : অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে নেয়ামতে সম্মানিত করেছেন, তার জীবনযাপনে প্রকাশ পায়। ধনাঢ্য, অবস্থাপণ্য ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির মতো থাকে, তবে তা আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করা হয়, এবং অকারণেই নিজের দরিদ্রতার প্রকাশ করা হয়।

পরিবারের সাথে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে একজন সাধারণ মানুষের মতোই থাকতেন। যেমন উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পরিচ্ছদ নিজেই পরিষ্কার করতেন। বকরির দুধ নিজেই দহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন। তারপর তিঁনি বললেন- কাপড়ে নিজেই তালি লাগাতেন, নিজেই জুতা গাঁট দিতেন—এভাবে নিজের অন্যান্য কাজও সারতেন। হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহাকে প্রশ্ন করা হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কীভাবে থাকতেন? তিঁনি জবাব দিলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের কাজকর্মে শরীক হতেন। আর যখন নামাজের সময় হয়ে যেত নামাজের জন্য বাহিরে চলে যেতেন।[৫৩]

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই জুতা ঠিক করতেন, নিজেই কাপড় সেলাই করে নিতেন—যেভাবে তোমরা ঘরের কাজ করে নাও।[৫৪]

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে কোমল ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, সবসময় তাঁর মুখে হাসি লেপ্টে থাকত।[৫৫]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যে তার পরিবারের বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক দয়ালু ও রহমদিল ছিল।[৫৬]

---

[৫৩] সহিহুল বোখারি, কিতাবুস সালাহ।
[৫৪] মুসান্নিফে আব্দর রাজ্জাক।
[৫৫] ইবনে আসাকির।
[৫৬] মুসনাদে আহমাদ, সহিহুল মুসলিম।

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম- যে তার পরিবার পরিজনের নিকট অধিক প্রিয়। আর আমি নিজ পরিবার পরিজনের নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়।[৫৭]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। খেতে ইচ্ছে হলে খেয়ে নিতেন, পছন্দ না হলে রেখে দিতেন।[৫৮]

বিপদ-আপদে সামনে, সম্মান ও প্রাপ্তিতে পিছিয়ে

নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, নৈকট্যপ্রাপ্তদের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্ধারিত ব্যবহারবিধি এমন ছিল : যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যতটা নিকটবর্তী হতো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদ-আপদে তাকে সে পরিমাণ এগিয়ে রাখতেন এবং পুরস্কার, সম্মান আর গণিমতের বণ্টনে ঠিক ততটাই পিছিয়ে রাখতেন।

যখন উতবাহ বিন রবিআহ, শায়বা বিন রবিআহ এবং ওয়ালিদ বিন উতবাহ (যারা আরবের নামকরা বাহাদুর আর যুদ্ধবাজ হিসেবে পরিচিত ছিল) বদরের যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীকে উত্তেজিত করে তুলছিল এবং সমকক্ষ যুদ্ধবাজদের আহ্বান করছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হামজা, হজরত আলি এবং হজরত উবাইদা রাদিআল্লাহু আনহুমকে তলব করলেন এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেরণ করলেন। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের সেসব যুদ্ধংদেহীদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিলেন। মুহাজিরিনে কেরামের মাঝে এমন অনেক যুদ্ধবাজ লড়াকু সাহাবী ছিলেন, যারা আরবের সেসব যুদ্ধবাজদের মুখোমুখি হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন। বনি হাশেম গোত্রের এই জানবাজদের সকলেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্তের সম্পর্কের এবং সবচেয়ে কাছের লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য অপর কাউকে বিপদে ফেলেননি, বরং তাদেরকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, তিনি তাদেরকে দুশমনের ওপর জয় দান করেছেন এবং তাদের বিজয়ী রূপে সম্মানিত করেছেন। হজরত হামজা, হজরত আলি রাদিআল্লাহু আনহুমা বিজয়ী এবং সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, আর হজরত উবায়দা রাদিআল্লাহু আনহুকে বিজয়ী তবে আহত অবস্থায় আনা হয়।

---

[৫৭] ইবনে মাজাহ।
[৫৮] বোখারি, মুসলিম।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সুদকে হারাম এবং জাহেলিয়াতের রক্তের বদলাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন, তখন তার শুরুতে নিজ চাচা হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদি., এবং ভাতিজার (রবিআহ বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র) বিষয়ে বলেন।

বিদায় হজের ভাষণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'জাহেলিয়াতের সময়কার সুদ আজ শেষ এবং বিলুপ্ত ঘোষিত হলো, এবং প্রথম সুদ যা আমি বিলুপ্ত করছি, সেটা আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। জাহেলিয়াতের সময়কার রক্তের বদলাও বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো, আর সেটা আমার ভাতিজার (রবিআহ বিন হারেসের ছেলে) রক্ত।'[৫৯]

সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য সাধারণ শাসক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের বিপরীতে নিজ নৈকট্যপ্রাপ্তদের সবসময় পিছিয়ে রাখতেন এবং অন্যদের তাদের বিপরীতে প্রাধান্য দিতেন। হজরত আলি রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : হজরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার চাক্কি চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় হজরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা খবর পেলেন, নবিজির দরবারে কিছু বাঁদি এসেছে। তিঁনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং প্রার্থী হলেন—যাতে সেখান থেকে কোনো বাঁদি তার সাহায্য সহযোগিতার জন্য মিলে যায়। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আর সেখানে উপস্থিত হননি। সেজন্য হজরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা, হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার নিকট বাঁদির বিষয়ে কথা বললেন, আর হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা নবিজির সাথে সে বিষয়ে কথা বললেন। সুতরাং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এখানে আগমন করলেন। সে সময় আমরা ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়েছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে আমরা দাঁড়াতে চাইলাম, কিন্তু তিঁনি বললেন- থামো! আমি আমার বুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা মোবারকের শীতলতা অনুভব করলাম। তিঁনি বললেন : আমি কি তোমাদের চাওয়া জিনিসের চেয়ে উত্তম জিনিসের সংবাদ দেবো না? যখন তোমরা ঘুমানোর জন্য বিছানা গ্রহণ করবে ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য সে জিনিস থেকে উত্তম হবে- যে জিনিসের প্রার্থনা তোমরা আমার কাছে করেছ।'[৬০]

---

[৫৯] সহিহুল মুসলিম, কিতাবুল হজ, হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। সেই ছেলের নাম কিছু বর্ণনায় 'ইয়াস' পাওয়া যায়।
[৬০] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল জিহাদ।

অন্য একটি বর্ণনায় ঘটনার সাথে এটাও যুক্ত করা হয়েছে : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন- আল্লাহর কসম, আহলে সুফফার সদস্যদের পেট ক্ষুধার তাড়নায় পিঠের সাথে লেগে যাচ্ছে—এই অবস্থায় আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারব না। আমার কাছে তাদের জন্য খরচ করার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমি এগুলো বিক্রি করে, বিক্রয়মূল্য আহলে সুফফার ওপর ব্যয় করব।[৬১]

কোমল উপলব্ধি ও আবেগের যথাযথ মর্যাদা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতে নবুওয়ত ও হকের দাওয়াতের মহিমান্বিত দায়িত্ব, মনুষ্যজাতীর দুঃখ দুর্দশা, অবারিত দুশ্চিন্তা নিরাশার সাথে জীবন অতিবাহিত করা—পাথরের জন্যও সম্ভব ছিল না। তাঁর মনুষত্বের কোমল অনুভব, পবিত্র ও শ্রেষ্ঠতম আবেগ, গোটা জমিন ও জলভাগের জন্য প্রদর্শনীয় অংশ হয়ে আছে। এই মহামূল্যবান গুণাগুণ, দৃঢ় প্রত্যয়—যা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের রীতি এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আর তা আল্লাহর পথের দাওয়াহ ও একত্ববাদের আহ্বান পৌঁছানোর পথে এবং এর দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে অন্য কোনো বস্তুকে না পরওয়া করে, আর না কোনো বিষয়কে বিশেষ মূল্যায়ন করে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সকল বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হতাশ করেননি, যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে লাব্বাইক বলে তার সঙ্গী হয়েছিল, হকের পথে নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিল, উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে চিরন্তন জীবনের সফলতা অর্জন লাভ করেছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা প্রায়ই আলোচনা করতেন, তাদের জন্য নিয়মিত দুআ করতেন এবং তাদের পাশে উপস্থিত হতেন।

এই ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা মনুষ্যদেহ ছাড়িয়ে সেসব জড়প্রদার্থ বে-জান পাথর, পাহাড় এবং উঁচুনিচু উপাত্যকা ছাড়িয়ে এমন কোনো জায়গা বাকি রাখেনি, যেখানে ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ-তিতিক্ষার এই মনোহর দৃশ্য অবলোকন করেনি। সৌভাগ্য সে জায়গার, যারা তা অবলোকন করতে পেরেছিল। হজরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পর্বতকে দেখে বললেন, এটা সেই পাহাড়, যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরা যাকে ভালোবাসি।[৬২]

---

[৬১] আহমাদের বর্ণনায়, ৭/২৩-২৪।
[৬২] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল মাগাজি।

হজরত আবু হামিদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলাম। যখন আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলাম, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা মদিনায়ে মুনাওয়ারা, আর ওটা ওই পাহাড়—যা আমাদের ভালোবাসে, যাকে আমরা ভালোবাসি।[৬৩]

হজরত উকবাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আহলে উহুদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করলেন।[৬৪]

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : আমি দেখেছি, যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আহলে উহুদের বিষয়ে আলোচনা করা হলো, তখন নবিজি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আল্লাহর কসম, আমারও ইচ্ছা ছিল যে উহুদের শহিদদের সাথে আমিও পাহাড়ের গিঁরিপথে অবস্থান নেব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রিয়তম চাচা এবং দুধ ভাইয়ের শাহাদাতের মানসিক আঘাত (যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসত ও বিশ্বাস করত এবং ইসলামের সাহায্য, সহযোগিতায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল, এবং তাদের মৃতদেহের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল, যা অন্য কারো সাথে করা হয়নি) আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের একনিষ্ঠ ধৈর্য ধারণের ক্ষমতায় সহ্য করতে পেরেছিল। কিন্তু যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ থেকে মদিনায় ফেরার সময় বনি আবদুল আশহালের বসতি অতিক্রম করছিলেন এবং তাদের শহিদদের জন্য কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন; এই দৃশ্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনুষ্য অনুভূতিকে বিদীর্ণ করে দিল, এবং আখিদ্বয় অশ্রুশিক্ত হয়ে গেল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'কিন্তু হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর জন্য অশ্রুপ্রবাহের কেউ নেই।'[৬৫]

মনুষ্য অনুভূতির এই উঁচুমাপের অনুভব ও আবেগ, নবুওয়ত ও ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছানোর কঠিন দায়িত্ব ও আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষার ব্যাপারে তিঁনি কখনো কোনো খামখেয়ালি করেননি। সিরাত গবেষক ও ঐতিহাসিকরা বলেন, যখন সাদ বিন মুআজ, আসইয়াদ বিন হাজির রাদিআল্লাহু আনহুমা বনি আশহালের বসতিতে ফেরত আসলেন, তাদের পরিবারের নারীদের বললেন- তৈরি হয়ে নাও এবং নবিজি

[৬৩] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল মাগাজি, তাবুকের যুদ্ধ।
[৬৪] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল মাগাজি।
[৬৫] ইবনে কাসির, ৩/৯৫। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এটাকে ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা সাইয়্যিদুনা হজরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর জন্য মাতম করো—সে নারীরা তেমনই করল। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন, তখন তাদের মসজিদে নববির দরজায় কান্নারত পেলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন! ঘরে ফিরে যাও, তোমাদের এখানে আগমনই দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় এটাও পাওয়া যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, আনসারি রাদিআল্লাহু আনহুমা নিজেদের মহিলাদের কী উদ্দেশ্যে এখানে পাঠিয়েছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের জন্য আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবাণীর দুআ করলেন। সুন্দর বাক্যে তাদের ডাকলেন এবং বললেন, আমার এটা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি মৃতব্যক্তির ওপর রোনাজারি পছন্দ করি না। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কান্না করতে নিষেধ করলেন।[৬৬]

এরচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি, শেরে খোদা সায়্যিদুনা হজরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর হন্তারক ওয়াহশি রাদিআল্লাহু আনহু যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখোমুখি হলেন। মুসলমানরা যখন মক্কা বিজয় করে নিলেন—পৃথিবী তখন ওয়াহশি রাদিআল্লাহু আনহুর জন্য অন্ধকার হয়ে উঠল এবং পথ সংকীর্ণ হয়ে গেল। তার ওপর অদৃশ্য বিপদ-আপদ তৈরি হয়ে গেল। তিনি শাম, ইয়ামান এবং অন্য প্রদেশে পলায়নের ইচ্ছা করলেন। তাকে লোকেরা বলল– সরল মানুষ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোনো লোককে হত্যা করেন না, যে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। তিনি লোকেদের কথায় অশ্বস্ত হলেন এবং কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন। মুসলমান হওয়ার পর যখন তিনি প্রথমবারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ইসলামগ্রহণকে স্বীকার করলেন এবং এমন কোনো কথা বললেন না, যার মাধ্যমে ওয়াহশি রাদিআল্লাহু আনহুর অন্তরে কোনো প্রকার ভয়ভীতির সৃষ্টি হতে পারে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর হত্যার ঘটনা শুনলেন ওয়াহশি রাদিআল্লাহু আনহুর মুখে। যখন ওয়াহশি রাদিআল্লাহু আনহু বলে শেষ করলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে মনুষ্য অনুভূতি ও প্রবৃত্তি অবশ্যই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই বিশেষ প্রবৃত্তি এবং আবেগ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের অনুগত মস্তিষ্ক এবং দায়িত্বের অনুভূতির সামনে জয়ী হতে পারেনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলে তার মুসলিম হওয়াকে অস্বীকার করতে পারতেন অথবা রেগে গিয়ে হত্যা করতে পারতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাঁকে এটুকু বললেন : হে আল্লাহর বান্দা, আমার

[৬৬] ইবনে কাসির ৩/৯৬।

সামনে এসো না। আমি চাই আমার দৃষ্টি তোমার ওপর না পড়ুক। ওয়াহশি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এরপর প্রতিটি ক্ষণে আমি ভীত থাকতাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না আবার আমাকে দেখে ফেলে– এভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রুত দিন চলে আসল।[৬৭]

বোখারি শরিফে বর্ণিত আছে : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি যখন আমার ওপর পড়ল, তিনি আমাকে লক্ষ করে বললেন- তুমিই কি ওয়াহশি? আমি বললাম- হ্যাঁ, আমিই ওয়াহশি। নবিজি বললেন- তুমিই কি হামজা রাদিআল্লাহু আনহুকে শহিদ করেছিলে? আমি বললাম- আপনার নিকট যে সংবাদ পৌঁছেছে, সেটা পুরোদস্তর সত্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি এই কাজটি করতে পারো যে, তুমি আমার সামনে আসবে না?[৬৮]

সেসব প্রকৃতিগত মনুষ্য অনুভূতি, প্রবৃত্তি ও শ্রেষ্ঠতম আবেগের ঝলক এখান থেকেও আমাদের সামনে আসে। একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির সাথে মিশে যাওয়া একটি পুরাতন কবরের পাশে আসলেন। সে সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে কমলতা প্রকাশ পেল এবং তিনি কান্না করে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, 'এটা আমেনার সমাধিস্থল।' এটা সে সময়কার কথা—যখন তার মৃত্যুর অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল।[৬৯]

[৬৭] ইবনে হিশাম ৬/৭৬, বোখারি শরিফে এই ঘটনা কিতাবুল মাগাজি অধ্যায়ে হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর হত্যা পরিচ্ছদে উল্লেখ করা হয়েছে।
[৬৮] সহিহুল বোখারি, হামজা রাদিআল্লাহু আনহু হত্যা অধ্যায়।
[৬৯] বায়হাকি, সুফিয়ান সাওরি রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণনায়।

ধৈর্য, সহনশীলতা ও অসহিষ্ণুতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্র, ধৈর্য, সহনশীলতা ও অসহিষ্ণুতার সামনে সমস্ত মনুষ্যজাতীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পিছিয়ে ছিল বহুগুণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।[৭০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেন —

أدبني ربي فأحسن تأديبي

আমার শিক্ষা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এবং উত্তম করে তৈরি করেছেন।

হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الافعال

আল্লাহ তাআলা আমাকে উত্তম চরিত্র এবং উৎকৃষ্ট কাজের পূর্ণতা দিয়ে প্রেরণ করেছেন।[৭১]

---

[৭০] সূরা কলম।

[৭১] শরহুস সুন্নাহ, মিশকাতুল মাসাবিহ।

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার কাছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বললেন—

كان خلقه القرآن

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা।

দয়া ও ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, অন্তরের প্রশস্ততা এবং ধৈর্যধারণের যে ক্ষমতা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে বিদ্যমান ছিল, সেখানে কোনো বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির জোর, কবির চিন্তাশক্তি ও ভাবনা পৌঁছাও ছিল অসম্ভব। যদি এই ঘটনাবলিকে বিশেষ এই প্রদ্ধতিতে উল্লেখ না করা হতো—যা কোনো প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে, তবে মনুষ্য মস্তিষ্ক আজ তা গ্রহণ করত না। কিন্তু এই বর্ণনা এমন পরিমাণ সহিহ এবং লাগাতার এমন বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য রাবী থেকে অন্য বিশ্বস্ত রাবীর মাধ্যমে এমন পন্থা ও পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাঝে এমন লাগাতার বিশুদ্ধ দলিল পাওয়ার গেছে, যার কারণে—সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বিষয়ের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি গ্রহণযোগ্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এখানে আমরা তেমনই কিছু ঘটনা বর্ণনা করব।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া, সহনশীলতা, বড় থেকে বড় শত্রুর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং মহানুভবতার এক নমুনা এমন ছিল : যখন মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই[৭২] বিন সালুলকে কবরে নামানো হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন এবং নির্দেশ দিলেন, তাকে কবর থেকে বের করে আনো! এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানুর ওপর রাখলেন এবং নিজ মুখের লালা তার ওপর লাগালেন এবং নিজ জামা মোবারক তাকে পরিধান করালেন।[৭৩]

হজরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাঁটছিলাম। নজরানের একটি চাদর সে সময় নবিজির গায়ে সজ্জা করে ছিল—যার কেনারা ছিল পুরু। রাস্তায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবিজির দেখা পেল এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর মোবারককে জোরে টান দিল। আমি মাথা উঁচিয়ে দেখলাম, চাদর টানার কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গলায় দাগ পড়ে গিয়েছে। তারপর সেই গ্রাম্য লোকটি বলল- হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর যে সম্পদ তোমার কাছে ছিল, সেটা আমাকে নেওয়ার অনুমতি দাও! নবিজি

[৭২] নবম হিজরিতে তাবুক থেকে ফেরার পথে তার মৃত্যু হয়।
[৭৩] সহিহুল বোখারি।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। অতঃপর বললেন, এটা তাকে দিয়ে দেওয়া হোক![৭৪]

জায়েদ বিন সা'নাহ (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন এবং ঋণের টাকা ফেরত চাইলেন, যা তিনি তার থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধ মোবারকের কাপড় ধরে জোরে টানলেন, এবং কঠিন ভাষায় কথা বললেন। তারপর বললেন- তুমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, বড়ই টালবাহানা করো। উমর রাদিআল্লাহু আনহু তাকে ধমকালেন, এবং উঁচু গলায় কথা বললেন। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা দীপ্তিময় ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন- উমর, আমি এবং সে ব্যক্তি, উভয়ই তোমার নিকট অন্য কাজের হকদার ছিলাম। আমাকে তুমি ঋণ দ্রুত পরিশোধের পরামর্শ দিতে এবং তাকে নরম ভাষায় কথা বলার পরামর্শ দিতে। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঋণ পরিশোধের এখনো তিনদিন বাকি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রাদিআল্লাহু আনহুকে সে ঋণ পরিশোধের আদেশ দিলেন এবং বিশ সা' অতিরিক্ত আদায় করতে বললেন—এটা উমর রাদিআল্লাহু আনহুর তাকে ভীত করার বিনিময় ছিল। আর এই কথাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে গেল।[৭৫]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : একবার মক্কার আশি জন অস্ত্রে সজ্জিত লোক 'তানঈম পর্বত' থেকে হঠাৎই নেমে আসল এবং ধোঁকায় ফেলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করতে চাইল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলকেই বন্দি করেলেন এবং জীবিত থাকতে দিলেন।[৭৬]

হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নজদের দিকে সেনা অভিযানে ছিলাম। রাস্তায় দুপুর হয়ে এল এবং বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভূত হলো। এই এলাকায় অধিক পরিমাণে তৃণলতা ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাবল গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং নিজ তরবারি তাতে ঝুলিয়ে রাখলেন। বাকিরাও বিভিন্ন গাছের ছায়ায় নিজেদের বিশ্রাম দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ডাকলেন, আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। সেখানে এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসা দেখলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আমি ঘুমিয়েছিলাম, এই ব্যক্তি আসল এবং আমার তরবারি

[৭৪] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল জিহাদ।
[৭৫] বায়হাকির বর্ণনা অনুযায়ী।
[৭৬] সহিহুল মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ।

ছিনিয়ে নিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম সে তরবারি নিয়ে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে বলল- তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাতে পারবে? আমি বললাম- আল্লাহ তাআলা। সে তরবারি কোষবদ্ধ করে নিল।[৭৭] তারপর সে বসে পড়ল। আর এই হলো সে ব্যক্তি- যে তোমাদের সামনে বসে আছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো শাস্তি দেননি।[৭৮]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নম্রতা, সহনশীলতার এই অবস্থান, সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমের নম্রতা মিলিয়েও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ ছিল না। অথচ সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন নম্রতা, ভদ্রতা, সহনশীলতার পূর্ণ সংমিশ্রণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান সে সমস্ত বিষয়ে সকলের জন্য এক বন্ধুবর শিক্ষক, দয়ালু-মেহেরবান শুভাকাঙ্ক্ষী ও অভিভাবক ছিলেন। তার একটি নমুনা হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি বলেন : একবার এক গ্রাম্য লোক মসজিদে পেশাব করে দিল। এটা দেখে লোকেরা তার ওপর হামলে পড়ল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং যেখানে সে পেশাব করেছে সেখানে এক বালতি বা কয়েক বালতি পানি ঢেলে দাও, এবং স্মরণ রেখো, তোমাদের সহজাত নম্রতা সৃষ্টির জন্য পাঠানো হয়েছে। সংকীর্ণতা ও কঠোরতা তৈরি করতে পাঠানো হয়নি।[৭৯]

মুআবিয়া বিন হাকাম রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামাজ পড়ছিলাম। এক ব্যক্তির হাঁচি আসল, আমি বললাম 'অ্যায়ারহামুকাল্লাহ'। লোকেরা এটা শুনে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, তোমাদের মা তোমাদের জন্য কান্না করুক। কী এমন হয়েছে, যার জন্য তোমরা আমাকে এমন বাঁকা দৃষ্টিতে দেখছ? এটা শুনে লোকেরা নিজেদের জানুর ওপর আঘাত করতে লাগল। যখন আমি বুঝলাম আমাকে চুপ করতে ইশারা করা হচ্ছে, আমি চুপ হয়ে গেলাম।

যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন—আমার মা-বাবা তাঁর ওপর কুরবান হোক! আমি না নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে, তাঁর মতো কোনো অভিভাবক ও শিক্ষক পেয়েছি, আর না নবিজির পরে কেউ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে না ধমকালেন, না মারলেন আর না কোনো কঠিন ভাষা ব্যবহার করলেন। শুধুমাত্র এটুকু বললেন, নামাজে সাধারণ মনুষ্যসুলভ কথা

---

[৭৭] এখানে 'শামাহ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এটার দুটি অর্থ হতে পারে, যেমন : 'তিনি তরবারি কোষবদ্ধ করে নিলেন।' আর এই অর্থও হতে পারে, 'তিনি তরবারি বের করলেন এবং তা দেখলেন।'

[৭৮] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল মাগাজি।

[৭৯] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল অজু।

বলার অনুমতি নেই। নামাজ শুধু তাসবিহ, তাকবির ও কোরআন তেলাওয়াতের জন্য।[৮০]

হজরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নিকট যদি কোনো প্রয়োজনগ্রস্ত আসত, তিনি অবশ্যই তার সাথে ওয়াদা করতেন এবং কিছু থাকলে তখনই তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। একবার তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, এক গ্রাম্য লোক এগিয়ে আসল এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় ধরে বলতে লাগল, আমার একটি সাধারণ প্রয়োজন থেকে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে, আমি আবার তা না ভুলে যাই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে গেলেন। যখন লোকটির কাজ সম্পন্ন হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় আসলেন এবং নামাজ আদায় করলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, প্রশস্ততা এবং ধৈর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা সম্পর্কে নবিজির খাদেম হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু সাক্ষ্য সে সময় দিয়েছিলেন, যখন তিনি অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন : আমি দশবছর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি। না তিনি কখনো 'হু' শব্দ ব্যবহার করেছেন, না কখনো বলেছেন সে কাজ তুমি কেন করলে না, বা সে কাজ তুমি কেন করলে?[৮১]

হজরত সাদ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার কাপড়ে জাফরান ছড়ানো সুগন্ধির আলামত ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখে বললেন– নিক্ষেপ করো, এবং আমার পেটে একটি ছড়ি দিয়ে মারলেন, যা দ্বারা আমি ব্যাথা অনুভব করলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার কেসাসের অধিকার আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেট থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং বললেন, কেসাস নিয়ে নাও![৮২]

[৮০] সহিহুল মুসলিম, বাবে তাহরিমুল কালামি ফিস-সালাত।
[৮১] সহিহুল মুসলিম, নবিজি সা. এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কিত অধ্যায়ে।
[৮২] কিতাবুশ শিফা। অবগত হওয়া উচিত, সাদ রা. এটা মজার ছলে বলেছিলেন, কেসাস নেওয়ার জন্য নয়।

নবিজির বিনয়

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে বিনয় ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। কিন্তু তিঁনি কোনো জিনিসে সুখ্যাত ও সুপরিচিত হওয়াকে পছন্দ করতেন না, আর না এমন করাকে ভালো ভাবতেন—লোকেরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকুক এবং তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জন করে কোনো স্বার্থ হাসিল করুক—যেমনটা পূর্বেকার উম্মতরা তাদের নবির সাথে করেছিল, অথবা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবদিয়্যাত (আল্লাহর বান্দা) ও রিসালাতের স্তর থেকে উঁচুতে তুলে ফেলুক!

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : আমাদের কাছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো কিছু ছিল না। আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম, কিন্তু এই ধারণায় দাঁড়াতাম না—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পছন্দ করবেন না।[৮৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো– হে সৃষ্টিজীবের সেরা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্থান।[৮৪]

হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার সামনে এভাবে আমার প্রশংসা অতিরঞ্জন করো না, যেভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা বিন মারয়ামের সামনে করত। আমি তো শুধুমাত্র একজন গোলাম। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল বলো।[৮৫]

---

[৮৩] তিরমিজি, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩২।
[৮৪] সহিহুল মুসলিম, কিতাবুল ফাদ্বায়িল।
[৮৫] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল আম্বিয়া।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে কোনো লৌকিকতা বা লজ্জা হতো না, কোনো গোলাম অথবা বিধবার সাথে চলতে—তাদের প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত।[৮৬]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : মদিনার পরিচারিকা, ক্রীতদাসীদের কেউ নবিজির হাত ধরে নিত এবং যা কিছু বলার, বলত এবং যতদূর নিয়ে যাওয়ার, নিয়ে যেত।[৮৭]

আদি বিন হাতেম তাঈ রাদিআল্লাহু আনহু যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন, নবিজি তাঁকে নিজ ঘরে ডাকলেন। বাঁদি হেলান দেওয়ার জন্য বালিশ দিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাকে নিজের এবং আদির মাঝে রেখে দিলেন এবং নিজে জমিনেই বসে পড়লেন। হজরত আদি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি এর থেকে বুঝে গেলাম—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদশাহ নন।[৮৮]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন, জানাযায় অংশ নিতেন এবং গোলামের দাওয়াত গ্রহণ করতেন।[৮৯]

হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বলদের জন্য নিজের গতি শ্লথ করে দিতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন।[৯০]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘমের রুটি এবং স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়া তরকারির আমন্ত্রণ হলেও তা গ্রহণ করতেন।[৯১]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- আমি গোলাম, গোলামদের মতোই খাই এবং তাদের মতোই বসি।[৯২]

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট উপস্থিত হলেন, আমি ছালের তৈরি চামড়ার বালিশ

---

[৮৬] বায়হাকি।
[৮৭] মুসনাদে আহমাদ ৩/১৯৮-২১৫।
[৮৮] জাদ্দুল মাআদ ১/৩৪।
[৮৯] শামায়েলে তিরমিজি।
[৯০] আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব লিল-মুনজারি।
[৯১] শামায়েলে তিরমিজি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনয় অধ্যায়, মুসনাদে আহমাদ ৩/২১১-২৮৯।
[৯২] কিতাবুশ শিফা।

নবিজির সামনে উপস্থাপন করলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে বসে পড়লেন এবং আমার ও তাঁর মাঝে বালিশটি রেখে দিলেন।[৯৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঘর পরিষ্কার করতেন, উট বাঁধতেন এবং পশুও নিজে চড়াতেন। নিজের খাদেমের সাথে খাবার সমান ভাগ করে নিতেন এবং আটা পেষার কাজে তার সহযোগী হতেন। বাজার থেকে সদাইও নিজে আনতেন।[৯৪]

[৯৩] আল-আদাবুল মুফরাদ পৃষ্ঠা ১৭২।
[৯৪] কিতাবুশ শিফা পৃষ্ঠা ১০১, বোখারির বর্ণনা থেকে।

বীরত্ব, বাহাদুরি ও লজ্জা-শরম

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতে বীরত্ব, বাহাদুরি ও লজ্জা-শরমের (যেগুলোকে লোকেরা পরস্পর বিরোধী ভাবে) একই নমুনা ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জা শরমের বিষয়ে হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দানিশীন কুমারি নারীর চেয়ে অধিক লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো জিনিস অপছন্দনীয় হতো, তার প্রভাব নবিজির চেহারার মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে যেত।[৯৫]

তিঁনি লজ্জা-শরমের কারণে কাউকে এমন কিছু বলতেন না, যা তার কাছে অপছন্দনীয় হয়। সুতরাং এই দায়িত্ব অন্য কাউকে অর্পণ করতেন। হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : নবিজির মজলিসে একজন লোক ছিল, যার কাপড়ের অধিকাংশ সোনালী রঙের ছিল। যেহেতু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরমের কারণে কাউকে তার অপছন্দনীয় কাজের কথা বলতে পারতেন না—সেজন্য যখন সে দাঁড়াল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বললেন, ভালো হতো তোমরা তাকে বলতে, সোনালী রঙের পোশাক পরিধান ছেড়ে দিতে।

হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন : যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো খারাপ কাজের সংবাদ পেতেন, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম নিয়ে বলতেন না—এমন কেন করলে? বরং তিনি বলতেন, লোকেদের কী হয়ে গেল যে, তারা এমন করছে! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সে কাজের বিরোধিতা করতেন ঠিকই, কিন্তু সে লোকের নাম উল্লেখ করতেন না।[৯৬]

---

[৯৫] সহিহুল বোখারি, কিতাবুল মানাকিব, ছিফাতুন নাবি অধ্যায়।
[৯৬] সুনানে আবি দাউদ।

বীরত্ব ও বাহাদুরি সম্পর্কে যতটুকু বলার- শেরে খুদা, হজরত আলী মুরতাজা রাদিআল্লাহু আনহুর সাক্ষ্যই তার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন : যখন রণক্ষেত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং মনে হতো চোখ তার কুঠোরি থেকে বেরিয়ে আসবে, সে সময় আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তালাশ করতাম তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে। কিন্তু আমরা দেখতাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে শত্রুর নিকটবর্তী আর কেউ নেই। বদরের যুদ্ধে আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল—আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে অবস্থান করছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের চেয়েও দুশমনের নিকটবর্তী ছিলেন।[৯৭]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব থেকে সুন্দর, সুশ্রী এবং শ্রেষ্ঠ দানবীর, উদার এবং বীরত্ব ও সাহসীকতায় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। এক রাতে মদিনাবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং যেদিক থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, লোকেরা সেদিকে এগিয়ে গেল। পথিমধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফিরে আসতে দেখলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওয়াজ শুনে তাদের আগেই সেদিকে গিয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় আবু তালহা রাদিআল্লাহু আনহুর ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। তাতে জিনও বাঁধা ছিল না। তরবারি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে ঝুলছিল। তিঁনি ঘোড়ার প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন, আমি এটাকে সমুদ্রের মতো পেয়েছি- দীপ্ত গতিসম্পন্ন।[৯৮]

উহুদ ও বদরের যুদ্ধে যখন বড় থেকে বড় বাহাদুর এবং সাহসীরা এদিক সেদিক পলায়নরত ছিল এবং ময়দান ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, সে সময়ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ খচ্চরের ওপর অনড়, অটল ছিলেন প্রশান্ত মনে। মনে হচ্ছিল যেন কোনোকিছুই হয়নি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কবিতাও পড়ছিলেন—

আমি নবি, এটা কোনো মিথ্যা নয়, আর আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।

[৯৭] কিতাবুশ শুফা, পৃষ্ঠা ৮৯।
[৯৮] আল-আদাবুল মুফরাদ পৃষ্ঠা ৪২।

স্নেহ ভালোবাসা ও সাধারণ দয়া

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বীরত্ব বাহাদুরির সাথে সাথে তিনি ছিলেন সীমাহীন কোমল মনের অধিকারী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ দ্রুতই আদ্র ও অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। দুর্বল মানুষ ও প্রাণহীন বাকরুদ্ধ জানোয়ারের সাথেও তিনি উত্তম ব্যবহারের আদেশ করতেন। হজরত শাদ্দাদ বিন আউস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিসের সাথে সুন্দর ব্যবহারের আদেশ করেছেন। সেজন্য জবেহ করলেও ভালোভাবে করবে। তোমাদের মধ্যে যে জবাই করতে চায়, সে যেন তার ছুরিকে ধারালো করে নেয় এবং জবেহকৃত পশুকে আরাম দেয়![৯৯]

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি একটি বকরিকে জবেহ করার জন্য মাটিতে শুয়াল, এরপর ছুরি ধার দিতে শুরু করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা দেখে বললেন, তুমি কি তাকে দুবার হত্যা করতে চাও? তাকে শুয়ানোর পূর্বেই কেন চুরি ধারালো করে নিলে না?[১০০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে পশুদের খাদ্যপানি দেওয়ার আদেশ করেছেন এবং তাদেরকে পেরেশান করতে অথবা তাদের দ্বারা অন্যায্য বোঝা বহন করানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা করেছেন। জন্তু-জানোয়ারের কষ্ট দূর করা এবং আরাম দেওয়ার বিনিময়ে সওয়াব পাওয়ার এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের ঘোষণা করেছেন। পশুর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন : এক ব্যক্তি কোথাও সফরে ছিল। পথিমধ্যে তার কঠিন পিপাসা লাগল। সম্মুখেই একটি কূপ দৃষ্টিগোচর হলো। সে তাতে নেমে পড়ল। যখন কূপ থেকে বের হয়ে আসল,

---

[৯৯] মুসলিম শরিফ।

[১০০] তিবরানি, এবং হাকেমের ভাষ্যনুযায়ী এই হাদিসটি বোখারির শর্তে সঠিক।

একটি কুকুরকে পিপাসায় কাদা চাটতে দেখল। সে মনে মনে অনুভব করল, পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এরও হয়তো এমন হয়েছে। লোকটি পুনরায় কূপে অবতরণ করল, নিজ চামড়ার মোজা পানি দিয়ে ভরাট করল, এরপর দাঁত দিয়ে ধরে ওপরে তুলল এবং কুকুরকে খাওয়াল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল—ইয়া রাসুলুল্লাহ, অন্য এমন পশুর বিষয়েও কি এই বিনিময় পাব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেক ওই সৃষ্টজীব, যে সজীব প্রাণের অধিকারী—তার জন্য বিনিময় পাবে।[১০১]

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একজন নারীকে শুধু এজন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কেননা সে তার বিড়ালকে দানাপানি দেয়নি এবং তাকে ছেড়ে দিয়েছে—যাতে সে পোকামাকড়ের মাধ্যমেই নিজ উদর পুর্তি করে।[১০২]

হজরত সুহাইল বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু (অন্য বর্ণনায় সুহাইল বিন রবিআ বিন আমর রা.) বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের ওপর সফর করছিলেন, যার পিঠ দুর্বলতার কারণে পেটের সাথে মিশে যাচ্ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই বাকশক্তিহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো! তাদের ওপর আরোহন করো ঠিকঠাকমতো। জবেহ করে তাদের গোস্ত ব্যবহার করতে হলে—এমনভাবে করো, যাতে সে ভালো অবস্থায় থাকে।[১০৩]

হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটি উট ছিল। যখন উটটি নবিজিকে দেখল ছটফট করতে শুরু করল এবং তার চোখ থেকে পানি প্রবাহিত হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটির কাছে গেলেন এবং তার কুঁজ ও গর্দানে নিজ মোবারক হাত বুলাতে লাগলেন। এতে করে উটটি শান্ত হয়ে গেল। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এই উটের মালিক কে? এক আনসারি যুবক বললেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ, এটা আমার উট। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে জানোয়ারের মালিক করেছেন, সে জানোয়ারের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় পাও না। সে আমার কাছে অভিযোগ করছে, তুমি তাকে কষ্ট দাও এবং সবসময় কাজে ব্যস্ত রাখো।[১০৪]

[১০১] সহিহুল বোখারি; কিতাবুল মুসা'কাহ, সহিহুল মুসলিম; বাবু ফাজলু সাকয়ুল বাহায়িম।
[১০২] ইমাম নববি, মুসলিম শরিফের বর্ণনা মতে।
[১০৩] আবু দাউদ।
[১০৪] আবু দাউদ।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি তোমরা কোনো সবুজ মাঠে যাও, তবে জমিন থেকে তাদের অধিকার নষ্ট কোরো না, আর যখন কোনো শুষ্ক ভূমিতে যাও—তখন তোমাদের উটকে দ্রুতগামী কোরো। রাতে ছাউনি স্থাপন করতে চাইলে, রাস্তায় কোরো না—কেননা সেখানে জন্তু-জানোয়ারের আসা যাওয়া চলতে থাকে এবং পোকামকড়েরা অবস্থান নেয়।[১০৫]

হজরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক প্রয়োজনে সেখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরে গেলেন। সেখানে আমরা একটি ছোট পাখি দেখলাম, সাথে দুটি ছানাও ছিল। আমরা দুটি ছানাকে নিয়ে নিলাম। পাখিটি এটা দেখে নিজের ডানা ঝাপটাতে লাগল। ইতোমধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে তাকে কষ্ট দিল? অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করলেন, তার ছানাকে ফেরত দাও! সেখানে আমরা পিঁপড়ার একটি জনপদ দেখতে পেলাম এবং তা জ্বালিয়ে দিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা কে করেছে? আমরা বললাম, আমরা করেছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগুনের শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে।[১০৬]

খাদেম, সেবক, শ্রমিক—যারা অন্য মানুষদের মতোই মানুষ এবং যাদের দয়া তাদের মালিকদের ওপর রয়েছে; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছেন- সেটা সবার জন্যই অভিন্ন।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তোমরা যা খাও, তাদের তা-ই খাওয়াও! যা তোমরা পরিধান করো, তাদেরও তা-ই পরিধান করাও! আর আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে শাস্তির মুখোমুখি কোরো না,[১০৭] আল্লাহ তাআলা যাদেরকে তোমাদের দায়িত্বে অর্পণ করেছেন। তোমাদের খাদেম, সেবক—তোমাদেরই ভাই। যার ভাই তার দায়িত্বে আছে, তার উচিত সে যা খায় তা-ই যেন তার ভাইকে খাওয়ায়। যা সে পরে, তা-ই যেন তার ভাইকে পরায়। তাদের জন্য এমন কোনো কাজ বাধ্যতামূলক কোরো না, যা তাদের ক্ষমতার বাহিরে। আর যদি এমন করতেই হয়, তবে তার সাথে নিজেও কাজে হাত লাগাও।[১০৮]

---

[১০৫] মুসলিম শরিফ।

[১০৬] আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ।

]১০৭] বোখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ পৃষ্ঠা ৩৮।

[১০৮] বোখারি, আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—এক গ্রাম্য লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি আমার গোলামকে একদিনে কতবার মাফ করব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সত্তর বার।[১০৯]

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শ্রমিককে তার শ্রমের মূল্য, তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিশোধ করে দাও![১১০]

[১০৯] তিরমিজি, আবু দাউদ।
[১১০] ইবনে মাজাহ।

বিশ্ববিজেতা, পূর্ণতার চিরন্তন নমুনা

উক্ত গ্রন্থের আলোচনার সমাপ্তিতে উসতাদ হজরত মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদবি রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'খুতবাতে মাদ্রাজ'-এর নির্বাচিত ও চয়নকৃত বাক্যমালায় সজ্জিত করা হয়েছে। যেখানে সাইয়িদ সাহেব রহিমাহুল্লাহ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণতা, বিশ্ববিজয়ী ও অক্ষয় চিরন্তন নমুনা ও সার্বজনীন সকল স্তরের পরিপূর্ণতা—পার্থিব জীবনেরও প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পেশা এবং কর্মব্যস্ততায়—সর্বোপরি সকলপ্রকার অবস্থানে ময়দান ও মাপকাঠি হিসেবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ সার্বজনীন জীবনে রয়েছে সহযোগী এবং উত্তম পন্থার পরিচায়ক হিসেবে, যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও পরিপূর্ণতার নিরিখে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি লিখেন—

'এমন এক মনুষ্য জীবন, যা মনুষ্য জাতির প্রতিটি দল এবং মনুষ্য প্রবৃত্তির ভিন্ন প্রতিটি দৃষ্টান্ত এবং প্রত্যেক প্রকারের যথার্থ আবেগ এবং পূর্ণতার চরিত্রের রাঙায়িত একত্র—শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতেই স্থান পেয়েছে। যদি তুমি ধনাঢ্য হও, তবে মক্কার ব্যবসায়ী এবং বাহরাইনের গুদামওয়ালার অনুসরণ করো! যদি তুমি গরিব হও, তবে শুআবে আবি তালিবের বন্দি ও মদিনার মেহমানদের অবস্থা শুনো! যদি তুমি শাসক হও, তবে আরবের সুলতানের অবস্থা পড়ো! যদি তুমি অধীনস্থ হও, তবে কুরাইশের প্রভাবাধীনদের এক পলক দেখো! যদি তুমি বিজয়ী হও, তবে বদর, হুনাইনের সিপাহসালারের দিকে দৃষ্টি রাখো! যদি তুমি বিপর্যস্থ হও, তবে উহুদের লড়াই থেকে শিক্ষা অর্জন করো! যদি তুমি উস্তাদ কিংবা শিক্ষক হও, তবে আহলে সুফফাহর শিক্ষা কেন্দ্রের সম্মানিত শিক্ষককে দেখো! যদি শিষ্য হও, তবে রুহুল আমিনের সামনে বসা লোকের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করো! যদি তুমি ওয়ায়েজ কিংবা নসিহত করো, তবে মসজিদে মদিনার মিম্বারে দাঁড়ানো

ব্যক্তির কথা শুনো! যদি তুমি একাকিত্ব কিংবা মানুষের অজান্তে আল্লাহকে ডাকার আবশ্যকতা সম্পন্ন করতে চাও, তবে মক্কার বন্ধু ও সাথিহীন নবির উত্তম আদর্শ তোমার সামনে আছে। যদি তুমি রবের করুণায় নিজ শত্রুদের মাথানত এবং বিরোধীদের দুর্বল করে থাকো, তবে মক্কা বিজয়ীর দৃশ্যায়ন করো! যদি তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দুনিয়াবি কাজে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সঠিক বাতায়নে করতে চাও, তবে বনি নাজির, খাইবার এবং ফিদাকের জমিনের মালিকের কারবার এবং শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার দিকে দেখো! যদি তুমি এতিম হও, তবে আবদুল্লাহ ও আমেনার হৃদস্পন্দনকে ভুলো না! যদি ছোট হও, তবে হালিমা সাদিয়া রাদিআল্লাহু আনহার সন্তানকে দেখো! যদি তুমি যুবক হও, তবে মক্কার এক মেষপালকের জীবন অধ্যয়ন করো! যদি তুমি সফররত ব্যবসায়ি হও, তবে বুসরার কাফেলার প্রধানের দৃষ্টান্ত পেশ করো! যদি তুমি আদালতের বিচারক হও বা পঞ্চায়েতের মধ্যস্থতাকারী হও, তবে কাবায় সূর্যের আলো নিপতিত হওয়ার পূর্বে প্রবেশ করা মধ্যস্থতাকারীকে দেখো—যিনি হাজরে আসওয়াদকে কাবার এক প্রান্তে দাঁড় করাচ্ছিলেন। মদিনার কাঁচা মসজিদে বসে থাকা ন্যায় বিচারককে দেখো, যার নিকট রাজা-বাদশাহ, আমির-গরিব সবাই সমান ছিল। যদি তুমি স্ত্রীর স্বামী হয়ে থাকো, তবে হজরত খাদিজা এবং হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহুমার স্বামীর জীবনী অধ্যয়ন করে দেখো! যদি তুমি সন্তানের জনক হও, তবে হজরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার পিতা এবং হাসান-হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার নানার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো! তুমি যা কিছুই হও এবং যেকোনো অবস্থাতেই থাকো, তোমার জীবনের জন্য দৃষ্টান্ত, জীবনাচরণের জন্য সহায়ক এবং জীবন সংস্করণের জন্য সমার্থক ও তোমার অন্ধকার গৃহের জন্য হেদায়েতের আলোকপ্রদীপ এবং সাহায্য-সহযোগিতা—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত ভাণ্ডারে সর্বক্ষণ এবং সর্বাবস্থায় বিদ্যমান পাবে। সেজন্য মনুষ্যত্বের স্তরের প্রতিটি শিক্ষানবিশ এবং ঈমানের নুরের প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু কলবের জন্য শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের দৃষ্টান্তই মুক্তিদিশা হতে পারে। তাঁর সামনে নুহ ও ইবরাহীম, আইয়ুব ও ইউনুস, মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের সিরাত বিদ্যমান আছে। যেহেতু সকল নবি আলাইহিমুস সালামের সিরাতই এক অঙ্গের দুটি কানের মতো। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত, চরিত্র ও কর্মপন্থা, দুনিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ বাজার, যেখানে প্রত্যেক জিনিসের ক্রেতা এবং প্রত্যেক জিনিসের অন্বেষার জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য বর্তমান রয়েছে।[১১১]

---

[১১১] খুতবাতে মাদ্রাজ পৃষ্ঠা ৯৬-৯৮।

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতে অবগাহনকারী ব্যক্তি তাঁকে পাবে অকৃপণ ঝরনার বহমানতায়; মানবমহত্ত্বের সর্বপ্রকারের জন্য যিনি অনুপেক্ষ সমৃদ্ধ এক উৎস। আর এমন হবেই না-বা কেন! তাঁকে তো আল্লাহ তাআলা সমগ্র বনি আদমের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন, তাঁর মাধ্যমে মোহর এঁটে দিয়েছেন নিজের নবি এবং রাসুলদের আগমন-ধারাবাহিকতায়। তাঁর জীবন ছিল সবচেয়ে বেশি জ্যোতির্ময়। মানবতা নিজের সূচনাতেই, সৃষ্টির প্রথম সকালেই তাঁকে চিনে নিয়েছিল; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কারণে হয়েছেন আল্লাহর এই বাণীর অধিকারী—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সুরা কলাম, আয়াত : ৪]

তাঁর উত্তম চরিত্র ছিল তাঁর নবুওয়্যাতের প্রমাণ; ফলে দেখা গেছে, স্বচক্ষে তাঁর মহান চরিত্র প্রত্যক্ষ করার পর বা তাঁর তিরোধানের পর তাঁর মহান চরিত্রের বিষয়টি অধ্যয়ন করে কিংবা শুনে অগণিত মানুষ ঈমান গ্রহণ করেছে। তাঁর চরিত্র ছিল বাস্তবানুগ—উত্তম চরিত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে যা জ্যোতির্ময় হয়ে ফুঠে উঠেছে।

সামনের আলোচনাগুলোতে আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্বের কিছু দিক জানতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

নবিজির সততা

একজন মানুষ যেসব উন্নত চরিত্রগুণে গুণান্বিত হয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ হয়, এর মধ্যে সততা অন্যতম। সততা তাই স্বাভাবিকতই কুরআন কারিমের গুরুত্বের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু; আল্লাহ তাআলাকে রব বিশ্বাসকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

> হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।
> [সুরা তাওবা, আয়াত : ১১৯]

আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন, এ কথা বোঝানোর জন্য, সমগ্র মুসলিম জাতিকে অবশ্যই সততার মহৎ গুণে গুণান্বিত হতে হবে। সততা প্রতিটি কল্যাণের চাবি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সততার গুণে ছিলেন অনন্য, অন্যতম, প্রধান উপমা। নবুওয়্যাতপ্রাপ্তির পূর্বেই কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল—সাদিক বা সত্যবাদী সম্বোধনে, আমিন বা বিশ্বস্ত উপাধিতে। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেদের জরুরি বিষয়গুলো আমানত রেখে নিজেদের বস্তু ও গোপন বিষয়গুলোর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকত। যখনই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়্যাত পেলেন, সাথে সাথে তাঁর বংশের লোকজনসহ আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলেই শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, যুদ্ধংদেহি ভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। এই সঙ্গিন পরিস্থিতিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মহান চরিত্রে ইস্পাতদৃঢ়ভাবে অবিচল থাকলেন; এমনকি সেসব আমানত ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর সততার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন—সবচেয়ে বড় শত্রুরা যেগুলো তাঁর কাছে আমানত রেখেছিল।[১১২]

---

[১১২] *সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : হাদিস : ১২৪৭৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১৮-২১৯; *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, তাবারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৬৯।

আল্লাহ তাআলা যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন—নিজের নিকটাত্মীদেরকে (পরকালের শাস্তি সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করো, তিনি সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক বললেন—

أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.

আমি যদি তোমাদের সংবাদ দিই, উপত্যকার পাদদেশে একটি অশ্বারোহী বাহিনী ওত পেতে রয়েছে, তারা যেকোনো মুহূর্তে তোমাদের ওপর হামলে পড়তে পারে, তাহলে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল—হ্যাঁ। আমরা তোমার ব্যাপারে কেবল সততার অভিজ্ঞতাই লালন করি। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আমি তোমাদের অত্যাসন্ন কঠিন আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি।[১১৩]

নবিজির সবচেয়ে বড় শত্রু—নজর ইবনু হারিসও তাঁর সততার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। সে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়—

يا معشر قريش، إنه والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر. لا والله ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن. لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وتخالجهم، وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر. لا والله ما هو بشاعر؛ قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها؛ هزجه ورجزه، وقلتم: مجنون. لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه ، يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم ، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم .

[১১৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৪৭৭০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৫০৭।

হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আল্লাহর কসম, তোমাদের ওপর এমন কঠিন বিপদ আপতিত হয়েছে, যেরকম বিপদ প্রতিরোধের কোনো কৌশল তোমাদের এখনো হস্তগত হয়নি। মুহাম্মদ ছিল তোমাদের মাঝে তরুণ—যুবক, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে বড় আমানতদার। যখন তোমরা তার দুই জুলফিতে শুভ্রতা দেখলে—সে পদার্পণ করল প্রৌঢ়ত্বে, তোমাদের কাছে যা নিয়ে আসার তা নিয়ে এলো, তখন তোমরা তাকে বললে—জাদুকর। আল্লাহর কসম, তিনি জাদুকর নন। আমরা তো জাদু দেখেছি, দেখেছি জাদুর ফুঁৎকার ও গ্রন্থি। তোমরা বললে—সে জ্যোতিষী। আল্লাহর কসম, তিনি জ্যোতিষী নন। আমরা তো জ্যোতিষী ও তাদের অবস্থা দেখেছি, তাদের তুকতাক শুনেছি। তোমরা বললে—সে কবি। আল্লাহর কসম, তিনি কবি নন। আমরা কবিতা দেখেছি, কবিতার সমস্ত প্রকার শুনেছি, কবিতার ঝংকার—তরঙ্গ দেখেছি। তোমরা বললে—সে পাগল। আল্লাহর কসম, তিনি পাগল নন। আমরা পাগল দেখেছি। পাগলের কথায় যে জড়তা, আবোলতাবোল ও অমূলক বক্তব্য থাকে, তা তাঁর কথাবার্তায় অনুপস্থিত। তোমরা নিজেদের অবস্থান দেখো। আল্লাহর কসম, তোমরা এমন বিপদে কখনো নিপতিত হওনি।[১১৪]

এসবের চেয়ে বড় বিষয় হলো—তাঁর সততার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যপ্রদান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

যিনি সত্যসহ এসেছেন এবং যাঁরা তাঁকে সত্যায়ন করেছেন, তাঁরা মুত্তাকি। [সুরা জুমার, আয়াত : ৩৩]

যিনি সত্যসহ আগমন করেছেন, তিনি আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যিনি তাঁর প্রতি সপ্তাকাশের ওপার থেকে অবতীর্ণ কুরআন কারিমের বিষয়বস্তুকে সত্যায়ন করেছেন, তিনি আল্লাহ তাআলা। এই আয়াতের সাথে সংযুক্ত করে ইমাম ইবনু আশুর বলেছেন—সত্যসহ আগমনকারী হলেন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর সত্যটি হলো আল-কুরআন।[১১৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা-সর্বদা মুসলিমদেরকে তাঁদের কথা-কাজে সত্যপথে চলতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন—

---

[১১৪] *সিরাতে ইবনু হিশাম* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৯-৩০০; *আর-রওজুল উনুফ*, আস-সুহাইলি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৮; *উয়ুনুল আসার*, ইবনু সায়্যিদিন নাস, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২৭।
[১১৫] *আত-তাহরির ওয়াত তানবির*, ইবনু আশুর, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৮৬।

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

তোমাদের জন্য সত্য অপরিহার্য। কারণ, সত্য নেকির পথে পরিচালিত করে, আর নেকি জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। মানুষ যখন সত্যপথে চলতে থাকে, সত্য অন্বেষণ করতে থাকে, তাকে আল্লাহর কাছে সিদ্দিক হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।

তোমরা মিথ্যাকে পরিহার করে চলবে। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের পথে পরিচালিত করে, আর পাপাচার জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। মানুষ যখন অবিরত মিথ্যা বলে, মিথ্যাকে খোঁজে, তাকে আল্লাহর কাছে মিথ্যুক হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।[১১৬]

এমনকি অনেক সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইরশাদ করতেন—

اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে আমার জন্য ছয়টি বস্তুর দায়িত্ব নাও, আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নেব। সেগুলো হলো :—কথা বললে সত্য বলো, প্রতিজ্ঞা করলে পূর্ণ করো, আমানত রাখা হলে তা প্রদান করো, তোমাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করো, তোমাদের চোখকে নিচু রাখো এবং তোমাদের হাতকে (অপরাধ থেকে) বিরত রাখো।[১১৭]

---

[১১৬] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ২৬০৭, *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস: ৪৯৮৯, *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস:১৯৭১, *ইবনু মাজাহ*, হাদিস: ৩৮৪৯।

[১১৭] *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ২২৮০৯। আল্লামা শুয়াইব বলেছেন—হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি এবং বর্ণনাটির রাবিগণ নির্ভরযোগ্য; *ইবনু হিব্বান* : হাদিস : ২৭১; হাকিম, হাদিস : ৮০৬৬, তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, তবে বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেননি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভবতার আরেকটি দিক হলো—তিনি নিজের পরবর্তী প্রজন্ম ও মুসলিমদের মাঝে সত্যকে ভালোবাসার শিক্ষা প্রোথিত করেছেন। এর সবচেয়ে বড় দলিল—আবুল হাওরা আস-সায়াদি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বললাম, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন বিষয়টি সংরক্ষণ করেছেন? তিনি বললেন—

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ .

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংরক্ষণ করেছি—সন্দেহপূর্ণ বিষয় ছাড়ো, নিশ্চিত বিষয় ধরো। কারণ, সত্য হলো তৃপ্ততা আর মিথ্যা হলো সংশয়তা।[১১৮]

এই ভালোবাসা এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি; এর মূল রহস্য—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং প্রতিটি কথা ও কাজে এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন; এমনকি ঠাট্টা ও মশকরার সময়, যখন মানুষ মিথ্যাকে বৈধ মনে করে, তখনো তিনি সত্যবাদিতার গুণে অবিচল থাকতেন। হজরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ احْمِلْنِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ .

জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল—হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে আরোহণের জন্য কোনো জন্তু দিন। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আমি তোমাকে উটের বাচ্চায় আরোহণ করাব। লোকটি বলল—হে আল্লাহর রাসুল, আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কী করব? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—উটনি তো বাচ্চাই জন্ম দেয়।[১১৯]

একজন সাধারণ মুসলিমের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই রসিকতা ছিল হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু সেখানেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য শব্দই ব্যবহার করেছেন।

---

[১১৮] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস : ২৫১৮, *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ১৭২৩।
[১১৯] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৪৯৯৮; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ১৩৮৪৪।

যুদ্ধের সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এর ব্যতিক্রম হতো না। বাকি যতটুকু মিথ্যা বলার অনুমতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দিয়েছেন, তা ছিল শত্রুর অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য, তাদের পক্ষ থেকে আশঙ্কাপূর্ণ ক্ষতিকে প্রতিরোধ করার জন্য;[১২০] কিন্তু সেখানেও তিনি সত্যই বলেছেন।

আমরা বদর যুদ্ধপূর্ববর্তী তাঁর অবস্থান দেখব, যেখানে কুরাইশরা মুসলিমদেরকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেছিল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, তাঁর সাথে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। উদ্দেশ্য ছিল—আরবের জনৈক বৃদ্ধের কাছ থেকে কুরাইশদের সংবাদ অবগত হওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরাইশদের সম্পর্কে, মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদেরকে সম্পর্কে, যা জানে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধ বলল—তোমাদের দুজনের পরিচয় না দিলে আমি তোমাদের কিছুই বলব না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি বললে আমরাও বলব। বৃদ্ধ বলল—তাহলে কি বিনিময় হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—হ্যাঁ। এবার বৃদ্ধ বলল—আমি জানতে পেরেছি, মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিরা অমুক অমুক দিন বের হয়েছেন। যদি আমাকে সংবাদদাতা সঠিক বলে থাকে, তাহলে তাঁরা অমুক স্থানে আছেন। (বাস্তবেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করছিলেন।) আর কুরাইশদের ব্যাপারে জানতে পেরেছি, তারা অমুক দিন যুদ্ধযাত্রা করেছে। যদি সাংবাদিক আমাকে সঠিক তথ্য দিয়ে থাকে, তাহলে তারা আজকে অমুক স্থানে অবস্থান করছে। (বাস্তবেও কুরাইশরা সেখানে অবস্থান করছিল।) কথা শেষ করে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল—তোমরা কারা, এবার বলো? জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

نحن من ماء

আমরা পানি হতে সৃষ্টি।

তারপর সেখান থেকে চলে গেলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল—'কীসের পানি থেকে? ইরাকের পানি থেকে কি?'[১২১]

---

[১২০] *রিয়াদুস সালিহিন*, ইমাম নববি, পৃষ্ঠা: ৫৬৫-৫৬৬।

[১২১] *উয়ুনুল আসার*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৯; *সিরাতুন নববিয়্যাহ*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৬; *আর-রওজুল উনুফ*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৩; *সিরাতে ইবনু হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬১৫।

আমরা খুব সুন্দর একটি ঘটনার মাধ্যমে এই আলোচনাটি শেষ করতে চাচ্ছি, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বনু হাওয়াজিনের প্রতিনিধিদলের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল; ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিনেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সত্যবাদিতার গুরুত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদেরকে বলেছিলেন—

أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ

আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বাণী হলো—সত্য কথা।[১২২]

এমনটিই ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। যেখানে প্রতিটি বস্তু সত্যের শুভ্রতায় আলোকময় ছিল। কারলাইল[১২৩] তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন—...তোমরা কি মনে কর, একজন মিথ্যাবাদী মানুষ জনপ্রিয় একটি ধর্ম আবিষ্কার করতে পারে? সে তো একটি ইটের ঘরও নির্মাণ করতে পারে না। যখন লোকে চুন, চুনকাম, মাটি ও গৃহনির্মাণ-প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পর্কে না জানে, তার দ্বারা বাড়ি নির্মাণ অসম্ভবপর। সে তো গড়বে ধ্বংসস্তুপের পাহাড় আর অনেক উপকরণের মিশেলে তৈরি বালুর চর! এমন ব্যক্তির নির্মিত ধর্মের দুইশ মিলিয়নেরও অধিক অনুসারীদের[১২৪] এক যুগও কি টিকে থাকার কথা! তারা তো বরং এমনভাবে ধ্বংস হয়ে পড়ার কথা, যাদের নামনিশানা পর্যন্ত থাকবে না। আমি খুব ভালোভাবেই জানি, এমন মানুষের জন্য প্রতিটি বিষয়ে স্বভাবগত নিয়মের অনুগামী হয়ে চলতে হয়, নতুবা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান হয়। ওই কাফিররা ইসলামের নবির বিরুদ্ধে যা ছড়িয়েছে, তা মিথ্যা। এ মিথ্যা প্রচারণার কারণে মানুষেরা সে মিথ্যাকে সত্য ভাবতে আরম্ভ করেছে...

দুর্ভাগ্য, তাদের এ বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের কারণে গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী প্রতারিত হয়েছে...[১২৫]

---

[১২২] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ২৩০৭; *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস: ২৬৯৩, *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ১৮৯৩৪।

[১২৩] টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ) একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল-আবতালে* তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি চমৎকার অধ্যায় রচনা করেছেন।

[১২৪] এই সংখ্যাটা ছিল কারলাইলের গ্রন্থ *আল-আবতাল* প্রকাশের সময়। কিন্তু ২০০৮ সালে মুসলিমদের সংখ্যা ১.৩ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। (সূত্র: *আশ-শারকুল আউসাত* পত্রিকা)

বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যা ১.৯ বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। সূত্র: উইকিপিডিয়া—নিরীক্ষক।

[১২৫] *আল-আবতাল*, কারলাইল, পৃষ্ঠা: ৪৩।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মানুষের অধিকার

ইসলাম মানুষের প্রতি সম্মান-মর্যাদাসহ মহত্ত্বের দৃষ্টিতে তাকায়। যেমন : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا.

নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; আমি তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদের উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [সুরা বনি ইসরাইল : ৭০]

মানুষের অধিকারের প্রতি ইসলামের এই সুদৃষ্টি তাঁকে বিশেষ ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এর অন্যতম হলো—সকল অধিকারের ব্যাপকতা। যেমন : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক অধিকার। এই অধিকার মানুষের প্রত্যেকটি শ্রেণিকেই পরিব্যাপ্ত করবে—হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম; বর্ণ, জাতি, ভাষা ও দ্বীনের মাঝে কোনো প্রকার ফারাক ছাড়াই এ অধিকার কার্যকরী। কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও পরিবর্তনের অবকাশ এতে নেই। এগুলো রাব্বুল আলামিনের শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োগ হবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। নবিজির শেষ খুতবাটি মানুষের অধিকারের বর্ণনায় সমৃদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত ছিল; সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ .

তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ তোমাদের ওপর হারাম, যেমন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের এই দিনটি হারাম, এই মাসটি হারাম এবং এই শহরটি হারাম।[১২৬]

নবিজির এই খুতবাটি সামগ্রিকভাবে সকলের অধিকারকে শক্তিশালী করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী—রক্ত, সম্পদ ও অস্থাবর সম্পত্তি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে মানুষের মর্যাদাকে বড় করে দেখেছেন, তাদের সবচেয়ে বড় অধিকার—জীবনের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি জবাবে বললেন—

اَلْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ .

কবিরা গুনাহ হলো—আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, কোনো প্রাণকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।[১২৭]

হাদিসে প্রাণ হত্যার কথা বলা হয়েছে। অন্যায়ভাবে যেকোনো শ্রেণির প্রাণ হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানবজীবনের হিতৈষণার কথা আলোচনা করেছেন, তখন আরও বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। একপর্যায়ে তিনি আত্মহত্যাকেও হারাম ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ করেছেন—

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي

[১২৬] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৪৪০৬, ৪৬৬২; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ১৬৭৯; *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস: ১৯৪৭; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ১৯৮৭৩।

[১২৭] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ২৬৫৩, *সুনানুন নাসায়ি*, হাদিস: ৪০০৯; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ৬৮৮৪।

نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا .

> যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে; চিরকাল সেখানে নিজেকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তার হাতে বিষ থাকবে, সে চিরকাল সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লৌহ-পদার্থ দ্বারা আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তার হাতে লৌহ-পদার্থ থাকবে, সে চিরকাল এর দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।[১২৮]

জীবনের অধিকারকে সংকুচিত করতে পারে, এমন প্রতিটি কাজকে ইসলাম হারাম করেছে—সে কাজটি হোক ভীতিকর, লাঞ্ছনাকর বা ক্ষতিকর।

হজরত হিশাম ইবনু হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সেসব মানুষকে আজাব দেবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেয়।[১২৯]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা মানবজাতির মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন—ব্যক্তির মাঝে, দলের মাঝে, জাতি ও গোষ্ঠীর মাঝে, বিচারক ও বিচারপ্রার্থীর মাঝে, শাসক ও জনতার মাঝে; এগুলোর মাঝে কোনো শর্ত ও ব্যতিক্রম নেই; আরবি ও আজমির মাঝে কোনো তফাত নেই; সাদা ও কালোর মাঝে কোনো বিভেদ নেই; শাসক ও শাসিতের মাঝে কোনো ফারাক নেই। মানুষের মাঝে বেশকম হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[১২৮] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৫৭৭৮; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ১০৯।
[১২৯] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ২৬১৩; *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস: ৩০৪৫; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ১৫৩৬৬।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

হে মানবজাতি, তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা একজন। সাবধান, অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের, কৃষ্ণের ওপর লালের, লালের ওপর কৃষ্ণের—তাকওয়া ছাড়া মর্যাদার কোনো সূত্র নেই।[১৩০]

♣♣♣

আমরা সাম্যনীতির ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ও শিষ্টাচার দেখার চেষ্টা করব, যেন তাঁর মহানুভবতা খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—হজরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধিত করে তিরস্কার করলেন, বললেন—হে কালো নারীর পুত্র, হজরত বেলাল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলেন। নবিজি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। পরবর্তী সময়ে হজরত আবু জর নবিজির কাছে এলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। হজরত আবু জর জানতে চাইলেন—আল্লাহর রাসুল, আমার ব্যাপারে এমন কোন সংবাদ পেয়েছেনে, যার কারণে আপনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন—

أنت الذي تعير بلالا بأمه! قال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي أنزل الكتاب على محمد - أو ما شاء الله أن يحلف - ما لأحد علي فضل إلا بعمل، إن أنتم إلا كطف الصاع.

তুমি বেলালকে ওর মায়ের প্রতি সম্বোধন করে তিরস্কার করেছ! নবিজি আরও বললেন—ওই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, অথবা অন্য কোনো শপথ করে বললেন—কেউ কেবল আমলের

[১৩০] *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস : ২৩৫৩৬; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, হাদিস: ১৪৪৪৪।

দ্বারা মর্যাদা লাভ করতে পারে। তোমাদের আমল তো সা (একটি পরিমাপ) পরিমাণ (সাধারণ ব্যাপার)।[১৩১]

সাম্যের অধিকারের সাথে আরেকটি অধিকার সংযুক্ত; তা হলো—ইনসাফ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি তাঁর সাহাবা কিরাম এবং উম্মাহকে শিখিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

বিচারক তিন শ্রেণির। তাদের এক শ্রেণি হবে জান্নাতি, আর দুই শ্রেণি হবে জাহান্নামি। জান্নাতি হলো সে বিচারক, যে সত্যকে বুঝে সে অনুযায়ী ফয়সালা করে। আর যে বিচারক সত্যকে বুঝে নিপীড়নমূলক ফয়সালা করল, সে জাহান্নামি। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি না বুঝে মানুষের মাঝে ফয়সালা করল, সেও জাহান্নামি।[১৩২]

ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তির আত্মসমর্থনমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের অধিকার হরণ করতে নিষেধ করতেন। নবিজি বলতেন—

فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

অধিকারীর কথা বলার অধিকার রয়েছে।[১৩৩]

যে ব্যক্তি মানুষের বিচার ও ফয়সালার পদে আসীন, তাকে উদ্দেশ্য করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

---

[১৩১] *শুয়াবুল ঈমান*, বাইহাকি, হাদিস: ৫১৩৫।
[১৩২] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৩৫৭৩; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস: ১৩২২; *ইবনু মাজাহ*, হাদিস: ২৩১৫।
[১৩৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ২৩০৬, ২৩৯০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ১৬০১।

যখন তোমার সামনে বিবদমান দু পক্ষ হাজির—প্রথমপক্ষ হতে যেভাবে শুনেছ, দ্বিতীয় পক্ষ থেকেও সেভাবে শ্রবণ করার আগ পর্যন্ত কখনো ফয়সালা করবে না। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্য এটিই সতর্কপূর্ণ পদ্ধতি।[১৩৪]

♣♣♣

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান অনুযায়ী আকিদা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাও মানুষের অধিকারের শামিল। প্রমাণ—আল্লাহ তাআলার কালাম—

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬]

নির্ধারিত কোনো একটি আকিদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে কাউকে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। সংগত কারণেই মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। অথচ তিনি তখন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও বিজয়ের অধিকারী ছিলেন। তারপরও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশদের বললেন—

اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

চলে যাও, তোমরা মুক্ত—স্বাধীন।[১৩৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মানুষের অধিকারের তালিকা আরও প্রলম্বিত। যেমন মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং ভাব ও স্বভাবের স্বাধীনতাও এখানে অন্তর্ভুক্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের মতামতকে সম্মান করতেন, মতামত প্রদানে উৎসাহ দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মত প্রদান করতেন, বিপরীতে অন্য কেউ ভিন্নমত প্রদান করত এবং সে মতের মাঝে যদি কল্যাণ নিহিত থাকত, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মত প্রত্যাহার করে ভিন্নমতকে গ্রহণ করতেন।

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে সংঘটিত ইতিহাসটি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সে সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মতকে প্রত্যাহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ যুবকদের মতকে বরণ

---

[১৩৪] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ৩৫৮২; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস: ১৩৩১; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ৮৮২।

[১৩৫] *সিরাতে ইবনু হিশাম* : ২/৪১১; *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক*: ২/৫৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির: ৪/৩০১।

করে নিয়েছিলেন; তারা মদিনার বাইরে গিয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করাকে প্রাধান্য দিয়েছিল; অথচ এটা ছিল নবিজির মতের বিপরীত।[১৩৬]

মানব-অধিকারের দাবি হিসেবে ব্যক্তিজীবনের অনন্য অধিকার শুধু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-প্রণীত বিধানের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হয়েছে, তা হলো—পর্যাপ্ত খোরপোষের অধিকার। এ ক্ষেত্রে সমস্ত মানবরচিত পদ্ধতি ও মানব-অধিকার সনদ নীরব।

পর্যাপ্ত খোরপোষের অধিকারের মর্ম হলো—প্রতিটি ব্যক্তি ইসলামি সালতানাতের নিয়ন্ত্রণে থেকে জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্জন করতে পারবে; লাভ করতে পারবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন, তার জন্য নিশ্চিত হবে যাপনযোগ্য জীবন। মূলত এই অধিকার মানবরচিত বিধানপ্রবর্তিত 'জীবিকা নির্বাহের ন্যূনতম অধিকারের' সম্পূর্ণ বিপরীত—যেটি মানুষের জীবনের ন্যূনতম সীমার প্রতি লক্ষ রাখে।[১৩৭]

পর্যাপ্ত খোরপোষের অধিকার আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়। যখন কোনো মানুষ অক্ষম হয়ে যায়, তখন জাকাত এই রুদ্ধতাকে দূর করে দেয়। জাকাতও যখন মুখাপেক্ষীর পর্যাপ্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, তখন রাষ্ট্রযন্ত্র এই প্রয়োজন পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অধিকারকে সমর্থন করে বলেছেন—

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ.

ওই ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমাল, অথচ অন্যদিকে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত; আর সে বিষয়টি জানে।[১৩৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করে বলেছেন—

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.

---

[১৩৬] *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : হাদিস : ১৩০৬১; *আর-রওজুল উনুফ* : ৫/২৪৫-২৪৬; *উয়ুনুল আসার ইবনু সাইয়্যিদিন নাস* : ১/৪১২; *সিরাতুন নববিয়্যাহ-ইবনু* কাসির : ৩/২৪

[১৩৭] *মাওসুআতু হুকুকিল ইনসানি ফিল ইসলাম*, খাদিজাতুন নাবরাবি : ৫০৫-৫০৯

[১৩৮] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, হাদিস: ৭৫০; *আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম*, হাদিস: ৭৩০৭; শুআবুল ইমান, বাইহাকি, হাদিস: ৩২৩৮।

আশয়ারিরা যখন যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে কিংবা মদিনায় তাদের প্রতিবেশীদের খাবার হ্রাস পায়, তখন তাদের নিকটে-থাকা সামান একটি কাপড়ে জমা করে; তারপর সেগুলো তাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেয়। তারা আমার দলভুক্ত, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১৩৯]

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অধিকার আদায়ে ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য এবং এর মহান রক্ষক। তিনি মানবজাতির প্রতি যে রিসালাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা ছিল ইনসানিয়াতের রিসালাত। এই রিসালাত এমন সমস্ত অধিকারের রক্ষক ছিল, যা প্রকৃত অর্থেই মানবতার সাথে সম্পৃক্ত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনসানিয়াত ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইনসানিয়াত—মহান মানবতা!

[১৩৯] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ২৪৮৬; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ২৫০০।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নারীর অধিকার

ইসলাম নারীকে যত্ন ও অনুগ্রহের বেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছে; তাকে উঁচু করেছে, তাকে সম্মানিত করেছে। কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে, বোন ও মা হিসেবে ইসলাম নারীকে বিশেষ মর্যাদা ও সদাচরণের অধিকারী করেছে। ইসলামই প্রথম এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে—নারী ও পুরুষের সৃষ্টিমূল একই। সংগত কারণেই মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

> হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্ঝা করে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১]

এ বিষয়ে আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো নারী-পুরুষের সমন্বিত মানবতার মধ্যকার উদ্ভূত বৈষম্যকে তিরোহিত করে ইসলামের ফয়সালা বর্ণনা করেছে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে, বর্বর যুগের নীতিমালা ও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কৃষ্টিকে অস্বীকার করে—যেগুলোতে নারীদেরকে নিচু করে উপস্থাপন করা হয়েছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর অধিকার রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছেন এবং নারীর

জন্য এমন নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যেখানে অতীতের দর্শনগুলো পৌঁছুতে পারেনি; এমনকি ভবিষ্যতেও কোনো জাতি সে পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। ইসলাম নারীর জন্য মা, বোন, বিবি এবং কন্যার মতো আদর, স্নেহ ও ভালোবাসাময় অধিকার নির্ধারণ করেছে। এখন পর্যন্ত চৌদ্দ শতাব্দী যাবৎ পশ্চিমা নারীরা তাদের অধিকার আদায় করার জন্য আন্দোলন করেই যাচ্ছে; কিন্তু হায়, এখনো তা সম্ভব হয়নি!

মৌলিকভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ নীতির জন্য উঁচু স্তরের মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। সেটা হলো—মর্যাদা ও অবস্থানগতভাবে নারীরা পুরুষের সমান। কেবল নারী হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা ও অবস্থান কখনো নিচু হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

নিশ্চয় নারীরা পুরুষের অংশ-বোন।[140]

অর্থাৎ নারীরা পুরুষের সাথে পূর্ণরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত—তিনি সর্বদা নারীদের জন্য অসিয়ত করতেন এবং সাহাবা কিরামকে বলতেন—

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

নারীদের জন্য কল্যাণের অসিয়ত গ্রহণ করো।[১৪১]

বিদায় হজের ভাষণের প্রাক্কালে লক্ষ লক্ষ উম্মতের সামনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নসিহতগুলো বারংবার উল্লেখ করেছেন।

আমরা যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-প্রদত্ত নারীর উচ্চতা ও মর্যাদা-বিষয়ক প্রবর্তিত বিষয়গুলো বর্ণনা করতে চাই, তখন আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—নারীদের প্রাচীন ও আধুনিক বর্বরতার পাল্লায় রাখা, যেন আমরা প্রকৃত অন্ধকারের স্বরূপ এবং এর চলমান অবস্থা অবলোকন করতে পারি; যাতে করে আমাদের সামনে ইসলামের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ছায়ায় নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়।

জাহালাতের যুগে আরবের প্রথা ছিল—কন্যা-সন্তানকে জীবিত প্রোথিত করা। পক্ষান্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজকে মহা অপরাধ ও হারাম

---

[১৪০] *সুনানুত তিরমিজি,* হাদিস : ১১৩; *সুনানু আবি দাউদ,* হাদিস: ২৩৬; *মুসনাদু আহমাদ,* হাদিস: ২৬২৩৮।

[১৪১] *সহিহুল বুখারি,* হাদিস: ৩৩৩১; *সহিহ মুসলিম,* হাদিস : ১৪৬৮।

ঘোষণা করেছেন; জাহেলি যুগের বর্বর মানুষরূপী পশুগুলো কন্যা-সন্তানকে জীবিত প্রোথিত করা ও এ নির্মম অপরাধকে তুচ্ছ মনে করার ব্যাপারে যে কুরআন কারিমের তিরস্কার ঘোষিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর ভিত্তি করেই একে মহা অপরাধ ও হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

(স্মরণ করো সে-সময়কে) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা-সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে—তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে? [সুরা তাকবির, আয়াত : ৮-৯]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অপরাধকে অন্যতম বড় অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম-আল্লাহর কাছে কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? নবিজি বললেন—আল্লাহর সাথে শরিক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম—অবশ্যই এটা বড় গুনাহ। তারপর কোন গুনাহটি বড়? নবিজি বললেন—তোমার সাথে আহার করবে—এই ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার জানতে চাইলাম—তারপর কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়? নবিজি বললেন—প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।[১৪২]

নারীর অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশু-কন্যাদের প্রতি অনুগ্রহের প্রতিও উৎসাহিত করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

[১৪২] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ২০০১; *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস: ৩১৮২; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস: ৪১৩১।

যে ব্যক্তি কন্যা-শিশুর (লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও বিয়ের) ঝামেলায় পতিত হয় এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, এই কন্যা শিশুরাই তার ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় হবে।[১৪৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা-শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদানপূর্বক ইরশাদ করেছেন—

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

যার একটি কন্যা-সন্তান আছে আর সে ব্যক্তি কন্যাটির সুন্দর শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করল, অতঃপর তাকে স্বাধীন করল ও বিয়ের ব্যবস্থা করল, সে দ্বিগুন নেকি পাবে।[১৪৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের প্রতি ওয়াজ-নসিহত করার জন্য একটি দিন বরাদ্দ রেখেছিলেন—সেখানে তাদের আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি তিনি নির্দেশ প্রদান করতেন।

যখন কন্যা যৌবনে পদার্পণ করে, পরিণত যুবতী হয়ে যায়, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ ও বর্জন করার অধিকার প্রদান করেন। তার ইচ্ছার বাইরে কোনো পুরুষের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তাকে জবরদস্তি করাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েজ বলেননি। এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

প্রাপ্তবয়স্কা নারী নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজ অভিভাবকের চেয়ে বেশি হকদার। কুমারী নারীর কাছ থেকে তার নিজের ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করা হবে, আর চুপ থাকা তার স্বীকৃতি বলে স্বীকৃত।[১৪৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন—

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

---

[১৪৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৫৯৯৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ২৬২৯।
[১৪৪] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৪৭৯৫।
[১৪৫] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ১৪২১।

প্রাপ্তবয়স্কা নারীর নির্দেশ ছাড়া এবং কুমারী নারীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।

সাহাবা কিরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কুমারীর অনুমতি কী? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

أَنْ تَسْكُتَ

চুপ থাকা।[১৪৬]

আর যখন সে কন্যা কারও স্ত্রীরূপে সংসারে প্রবেশ করবে, তার সাথে সদাচরণ ও সুসম্পর্ক গড়ার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুপ্রেরণা রয়েছে। তিনি এ কথা পরিষ্কারভাবে বলতেন—স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করা পুরুষের ব্যক্তিগত আভিজাত্য ও স্বভাবগত সভ্যতার প্রমাণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন—

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ الْمَاءِ أُجِرَ

পুরুষ যখন স্ত্রীকে পানি পান করায়, তাকে প্রতিদান প্রদান করা হয়।[147]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ

হে আল্লাহ, আমি দুজন দুর্বলের অধিকারের ব্যাপারে কষ্ট করি—এতিম এবং নারী।[148]

❋❋❋

স্ত্রী যখন স্বামীকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করে, তার সাথে সংসার করাকে সহ্য করতে পারে না, তার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ-বিচ্ছেদের বিধান রেখেছেন। এর পদ্ধতি হবে—খোলা।[১৪৯]

---

[১৪৬] *সহিহুল বুখারি,* হাদিস: ৫১৩৬।

[১৪৭] *মুসনাদু আহমাদ,* হাদিস: ১৭১৯৫।

[১৪৮] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* হাদিস : ৩৬৭৮; *মুসনাদু আহমাদ,* হাদিস: ৯৬৬৪।

[১৪৯] অর্থাৎ স্ত্রী কোনোভাবে স্বামীকে রাজি করিয়ে তার কাছ থেকে তালাক নিয়ে নেবে।—অনুবাদক

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—সাবিত ইবনু কাইসের স্ত্রী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন—হে আল্লাহর রাসুল, আমি সাবিতের ধর্ম ও চরিত্র কোনোটির ওপরই বীতশ্রদ্ধ নই; তবে তার সাথে সংসার করলে আমি কুফরির ভয় করছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

তুমি কি তার বাগানটা (মোহর হিসেবে প্রাপ্ত) তাকে ফিরিয়ে দেবে?

সে বলল—হ্যাঁ। সে স্বামীকে তার বাগানটা ফিরিয়ে দিলো। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়ে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করে দিলেন।[১৫০]

যেহেতু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর জন্য পুরুষের মতো স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অধিকার প্রমাণ করেছেন, সুতরাং তাদের জন্য ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া-নেওয়া, উকিল নিয়োগ করা এবং উপহার-উপঢৌকন দেওয়াসহ সবকিছুর অধিকার সাব্যস্ত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নারী বুদ্ধিমতী ও বোধসম্পন্ন থাকবে, তার এসব অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করো। [সুরা নিসা, আয়াত : ৬]

হজরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন দুজন মুশরিককে আশ্রয় দিলেন, তার ভাই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যা করতে চাইলেন। এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা ছিল এমন—

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ

হে উম্মে হানি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।[১৫১]

---

[১৫০] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৫২৭৬।
[১৫১] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৩১৭০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ২৩৬।

এ ফয়সালার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যুদ্ধকালীন ও স্বাভাবিক সময়ে অমুসলিমদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার ও প্রতিবেশী বানানোর অধিকার প্রদান করেছেন।

এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ছায়ায় মুসলিম নারী সম্মানজনক, আভিজাত্যপূর্ণ, অভিভাবকসুলভ জীবনযাপন করত।

বৈজ্ঞানিক মুজিযা

কুরআন কারিম আরেক প্রকার মুজিযা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে; সেটি হলো—বৈজ্ঞানিক মুজিযা। এই মুজিযাটির ব্যাপারে প্রাচীন মুসলিম আলেমগণ আলোচনা করেননি। তাদের কাছে কুরআন কারিমের গুরুত্বপূর্ণ মুজিযার দিকগুলো ছিল—কুরআনের বালাগাত—অলংকার, নজম—শব্দের বুনন, কুরআনের ইতিহাস, কুরআনের ভাষা ইত্যাদি; তারা কুরআন কারিমের ইলমি-বৈজ্ঞানিক মুজিযা নিয়ে আলোচনার পথে হাঁটেননি। এই শিরোনামে আমার আলোচনার উদ্দেশ্য হলো—কুরআন কারিমের এমন অনুকরণময় *বৈজ্ঞানিক মূলনীতিগুলোর* নানা রঙ আলোচনা করা, যেগুলোর বিদ্যমানতা ও উদঘাটনে অনেক ওলামা কিরাম বিস্মিত হয়েছেন।

কুরআন কারিম এমন অনেক বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতসমৃদ্ধ গ্রন্থ, যে ইঙ্গিতসমূহ হিদায়াতপ্রাপ্তির উপলক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, কুরআন শুধুই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয়।

বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতের উপমা হলো—কুরআন কারিম উদ্ভিদের কলম করা নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে সেখানে কলম করার আলোচনা হয়েছে এক উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদে স্থানান্তর করার মাধ্যমে; এর মাধ্যমগুলোর একটি হলো বাতাস। কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ

আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি। [সুরা হিজর, আয়াত : ২২]

কুরআন কারিমে উল্লিখিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক উদাহরণ হলো—মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ তত্ত্ব; এর বিশুদ্ধতা বর্তমান বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেছে। চৌদ্দশ বছর পূর্বে কুরআন মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের তত্ত্ব দিয়েছে, অথচ তখন

জ্যোতির্বিদ্যা মাত্র তার প্রাথমিক স্তর পাড়ি দিচ্ছিল। কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

আর আমি আসমান নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি নিশ্চয়ই মহাসম্প্রসারণকারী। [সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৭]

আয়াতে 'سماء' শব্দটি কুরআন কারিমের বিভিন্ন জায়গায় 'মহাবিশ্ব' ও 'মহাকাশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের এই আয়াত মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের তত্ত্ব উন্মোচন করেছে— যে তত্ত্বের সন্ধান বিজ্ঞান পেয়েছে আমাদের যুগে এসে; এমনকি বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত একটিই বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রচলিত ছিল; সেটি হলো—মহাবিশ্বের প্রকৃতি হলো স্থির, তা অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আলোচনা-পর্যালোচনা, গবেষণা ও হিসাব-নিকাশ করে বোঝা গেছে, এই মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে এবং তা সুশৃঙ্খলভাবে প্রলম্বিত হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেলজিয়ামের পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ জর্জ লুমিটার দর্শনের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন—মহাবিশ্ব সর্বদা সঞ্চালিত হয়, প্রলম্বিত হয়। এই বাস্তবতাকে সমর্থন করেছেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল; মৃত্যু ১৯২৯ ইং।[১৫২] তিনি প্রমাণ করেছেন—তারকারাজি ও গ্যালাক্সি বা ছায়াপথসমূহ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সর্বদা সঞ্চালিত হতে থাকে। সঞ্চালিত হওয়ার এই পদ্ধতিটি সর্বদা প্রলম্বনশীল একটি রূপ।[১৫৩]

কুরআন কারিমের মুজিযামূলক কয়েকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

সূর্য নিজ নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৩৮]

নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে থাকা একটি বিশাল মুজিযা। এটা সূর্যের বাহ্যিক চলা বোঝায় না, যেমনটা মানুষ উদয়কালে দেখতে পারে; বরং এটা প্রকৃত নড়াচড়াই বোঝায়; আবহাওয়াবিদরা বিষয়টি প্রমাণ করেছে। সৌর ইনসাইক্লোপিডিয়া বলছে—সূর্য তার কক্ষপথের চারদিকে প্রত্যেক পাঁচিশ দিনে একবার ঘোরে।[১৫৪]

---

[১৫২] edwin hubble(১৮৮৯-১৯৫৩)

[১৫৩] সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৩৮

[১৫৪] *আল-মাউসুআতুল ফালাকিয়্যাহ*, খলিল বাদাবি, পৃষ্ঠা : ২১।

তেমনিভাবে গতি নির্ধারিত রয়েছে পৃথিবীর ছায়াপথের—যার অধীন সূর্যও আছে। আমাদের ছায়াপথ মহাশূন্যের অন্যান্য ছায়াপথ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৯৮০ কিলোমিটার দূরে সরে যায়।[১৫৫]

❋❋❋

আরেকটি মুজিযা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِۙ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ

তিনি পাশাপাশি দুটি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। [সুরা আর-রহমান, আয়াত : ১৯-২০]

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—ভূমধ্য সাগর যখন জিব্রালটার পাহাড়ের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়, তখন উভয়ের মাঝে একটি অন্তরায় থাকে। দুটি সাগরের পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে জানা গেছে—ভূমধ্যসাগরের লবণাক্ততা ও উষ্ণতা আটলান্টিকের চেয়ে বেশি; উভয়টিতে অবস্থিত প্রাণীদের মধ্যেও বেশকম আছে।[১৫৬]

স্যার জন এমেরি মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশনের সাথে মিলে আকাবা উপসাগরের পানি সম্পর্কে কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন; যাতে প্রমাণিত হয়েছিল, রাসায়নিক এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও গঠনগত দিক থেকে এটি লোহিত সাগরের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির।[১৫৭]

মুজিযাপূর্ণ আরও আয়াত হলো—

وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا

এবং (আমি কি) পর্বতমালাকে পেরেক (বানাইনি)? [সুরা নাবা, আয়াত : ৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

আর তিনি পৃথিবীর ওপর বোঝা রেখেছেন, যেন কখনো তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে। [সুরা নাহল, আয়াত : ১৫]

---

[১৫৫] *আশ-শামস, ইবরাহিম গোরি*, খণ্ড : ১৮।
[১৫৬] *আল-ইজাযুল কুরআনি ফি জাওয়িল ইকতিশাফিল ইলমিল হাদিস*, মারওয়ান তাফতানজি, খণ্ড : ৩৮৪।
[১৫৭] *লাফতাতুন ইলমিয়্যাতুন মিনাল কুরআন*, ইয়াকুব ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ৫৭।

আধুনিক যুগের ভূতাত্ত্বিকগণ গবেষণা করে জানতে পেরেছেন, পাহাড়ের নিচে এক প্রকারের সম্প্রসারিত শিকড় রয়েছে—যা এমন আঠালো স্তরে প্রোথিত, যেটির ওপর রয়েছে শিলার স্তর। আল্লাহ তাআলা এই সম্প্রসারিত শিকড় বানিয়েছেন মহাদেশগুলোকে ধারণ করে রাখার জন্য, যেন পৃথিবী ঘূর্ণনকালে সেগুলো নড়াচড়া না করে। এ বাস্তবতা সম্পর্কে গবেষকগণ নিশ্চিত হয়েছে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এসে।[১৫৮]

গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে, প্রত্যেক মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন পাহাড় রয়েছে, যেগুলো মহাদেশগুলোকে ধারণ করে রেখেছে। ভূখণ্ডের যে অংশে পাহাড় অবস্থিত, যেসব প্রস্তরের সমন্বয়ে তা গঠিত এবং তার আশপাশে অবস্থিত জমিনের প্রকৃতি—এ প্রত্যেকটির সাথে পাহাড়ের উচ্চতার সাযুজ্য থাকে। ভূতাত্ত্বিকগণ গবেষণা করে পেয়েছেন, ভূখণ্ডে পাহাড় এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন এর দ্বারা জমিনকে হেলে-দুলে পড়া থেকে হেফাজত করা যায়।[১৫৯] কুরআন কারিম আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই এই সত্য বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তাআলা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই বলেছেন।

আল্লাহ তাআলার এই কথাটি নিয়ে একটু ভাবি। তিনি ইরশাদ করেছেন—

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ

এবং (শপথ) উত্তাল সমুদ্রের। [সুরা তুর, আয়াত : ৬]

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলার কসম বিবৃত হয়েছে। তিনি সমুদ্রকে বলেছেন—'তা উত্তাল'। কসম ব্যবহার করা হয় গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। অথচ আল্লাহর কালামে গুরুত্ব বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই, তা এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا

আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে হতে পারে? [সুরা নিসা, আয়াত : ২২]

তারপরও কেন আল্লাহ তাআলা কসম খেয়েছেন? গাফিলদেরকে সতর্ক করার জন্য, অনুগতদেরকে পথ দেখানোর জন্য, কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

সমুদ্র উত্তাল হওয়ার মর্ম হলো—আগুন প্রজ্বলিত হওয়া উত্তপ্ত হওয়া। আল্লাহ তাআলার কসম খাওয়ার কারণ হলো—পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রমাণ করা, সমুদ্রগুলোকে আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। এখানে উত্তাল সমুদ্র দ্বারা দুনিয়ার সমুদ্র

[১৫৮] *কিতাবুত তাওহিদ*, আবদুল মজিদ জানদানি, পৃষ্ঠা : ৭২।
[১৫৯] *আল-ইজাযুল কুরআনি ফি জুয়িল ইকতিশাফিল ইলমিল হাদিস*, মারওয়ান তাফতানজি, পৃষ্ঠা : ৩৫২।

উদ্দেশ্য, পরকালের সমুদ্র নয়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানের যুগে কুরআনের এই হাকিকতকে উন্মুক্ত করা। সমুদ্রজ্ঞানীরাও যেন অনুধাবন করতে পারেন, ভূগর্ভে উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি মজুদ রয়েছে।

ডক্টর জামালুদ্দিন আল-ফিন্দি তদীয় গ্রন্থ *তাবিয়াতুল বাহরি ওয়া জাওয়াহিরুহু*-তে বলেছেন—গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সমুদ্রের তলদেশে আবরণের মাঝে কিছু ফাঁকা ও গভীর গর্ত রয়েছে। এর কারণ হলো, সমস্থিতি তৈরির উদ্দেশ্যে আবরণের মাঝে বিভিন্ন সংকোচন ঘটলে তাতে কিছু ফাটল সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে ফাটল সৃষ্টি হয় তাপমাত্রার ব্যবধানের ফলে তাপজনিত সম্প্রসারণ ও ঠান্ডাজনিত সংকোচনের প্রতিক্রিয়ায়। এ ধরনের দুর্বল সম্প্রসারিত স্থানগুলোর দৈর্ঘ্য অনুসারে জমিনের তলদেশের আবরণের ভেতর থেকে গলিত আগ্নেয়গিরির লাভা ছুটে আসে। এরপর প্রবলবেগে তা সমুদ্রের ওপর আছড়ে পড়ে; কিন্তু তা সমুদ্রের পানির ভারত্বের কারণে বাধার সম্মুখীন হয়; এমনকি সমুদ্রের নিজস্ব আগ্নেয়গিরি এর লাভাকে ওপরের দিকে ছুড়ে মারে। ক্রমাগত গলিত লাভার আঘাতের কারণে ওপরের দিকে শঙ্কুসদৃশ একটি মুখ তৈরি হয়। এই মুখ দিয়ে আসা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের কারণে অনেক দ্বীপপুঞ্জ বিস্ফোরণ ঘটে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন : ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব হিন্দুস্থানের দ্বীপপুঞ্জের মাঝ থেকে কারাকাতো দ্বীপের বিস্ফোরণ ঘটে। ক্রমাগত দুই দিন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে ভূখণ্ডের ১৪০০ ফিট ওপরে থাকা দ্বীপটি সমুদ্রে তলিয়ে যায়। কেবল এর মৌলিক চূড়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া কিছুই টিকে ছিল না।[১৬০]

জর্জ গামো তদীয় গ্রন্থ *কাওকাবুন ইসমুহুল আরদ*-এ একটি পরিচ্ছেদ এনেছেন, যার শিরোনাম হলো—'জাহান্নাম আমাদের পায়ের নিচে'। তিনি সেখানে কথা বলেছেন সমুদ্রের তলদেশের উত্তপ্ততা নিয়ে, আগুন নিয়ে এবং আগ্নেয়গিরির তরঙ্গ নিয়ে। আলোচনার প্রারম্ভেই বলেছেন—গভীরতার সাথে সাথে তাপমাত্রার প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। উত্তাল আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বিচ্ছুরিত কালো ধোঁয়ার উত্তোলন, এর আশপাশে ছড়িয়ে-পড়া অস্থির উদ্দীপ্ত লাভা, উত্তপ্ত পানির ঝরনা—এসবই এ বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করছে, জ্বলন্ত আগুনের এমন অস্তিত্বের প্রমাণের প্রতি, যেগুলো দূরে নয়—বরং আমাদের সন্নিকটে, যা তৈরি করা হয়েছে অপরাধীদের জন্য।[১৬১]

এখানে নিশ্চিতভাবে মুজিযার বিষয়টি পরিষ্কার। আল্লাহ তাআলার কিতাব সাব্যস্ত করেছে, সমুদ্রের তলদেশ আগুন দ্বারা উত্তপ্ত। ইতিপূর্বে এমনকি কুরআন অবতীর্ণকালেও বিশাল এই হাকিকত সম্পর্কে জানা যায়নি। বিংশ শতাব্দীতে এসে

---

[১৬০] *তাবিয়াতুল বাহরি ওয়া জাওয়াহিরুহু*, মুহাম্মদ জামালুদ্দিন আল-ফিন্দি, পৃষ্ঠা : ২১০।
[১৬১] *কাওকাবুন ইসমুহুল আরদ*, জর্জ গামো, পৃষ্ঠা : ৭৪।

সমুদ্রবিজ্ঞানীরা 'وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ'—'এবং (শপথ) উত্তাল সমুদ্রের।' [সুরা তুর, আয়াত : ৬]—আয়াতটি পড়ে বিস্মিত হয়ে বলছে—কে সেই সত্তা, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছেন, সমুদ্রের তলদেশ উত্তপ্ত—সেখানে এমন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে, যা অগ্নিলাভা ছুড়ে মারে![১৬২]

☘☘☘

আমরা যখন আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি—

وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

> আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। [সুরা জারিয়াত, আয়াত : ৪৭]—

নিয়ে ভাবি, তখন বুঝতে পারি—কুরআন কারিমের যে আয়াতটি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, সেটি মহাবিশ্বের ক্রমাগত বিস্তৃতি নিয়ে কথা বলে (অর্থাৎ কুরআন কারিম বলে—পৃথিবী ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে।), জানিয়ে দিচ্ছে, তা স্থির নয়। যে হাকিকত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অবহিত করেছেন অনেক আগে; সে হাকিকত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে এসে জ্যোতির্বিদ ও মহাকাশবিজ্ঞানীরা উদ্‌ঘাটন করেছেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা মহাবিশ্বের স্থিতি ও অপরিবর্তনের পক্ষে স্লোগান দিত; উদ্দেশ্য ছিল—নতুন সৃষ্টি এবং স্রষ্টাকে অস্বীকার করা। কিন্তু আমাদের ছায়াপথের বাইরের ছায়াপথগুলো নিয়ে ডপলারের গবেষণার মাধ্যমে এর উল্টো প্রমাণিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিখ্যাত গবেষক (C.doppler) সি. ডপলার দ্রুতগামী রেলগাড়ির অতিক্রমকালে এর হুইসিলের সাধারণ ভাব লক্ষ করেছেন। রেলগাড়ি-পর্যবেক্ষক এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাবে, যা ক্রমাগত ও স্থির ধরনের। কিন্তু রেলগাড়িটি পর্যবেক্ষকের যতই কাছাকাছি হয়, আওয়াজের কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকে। আবার যতটা দূরে চলে যায়, আওয়াজের কম্পাঙ্ক কমতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে ডপলার গবেষণা করেছেন এবং এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন—রেলগাড়ির হুইসিল বাতাসের মধ্যে ক্রমাগত কিছু শব্দতরঙ্গ ছোড়ে। যখন শব্দের উৎস পর্যবেক্ষকের কাছাকাছি হয়, শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকে এবং কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকে। এর উল্টো যখন শব্দের উৎস পর্যবেক্ষক থেকে দূরে যেতে থাকে, তখন শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রলম্বিত

---

[১৬২] *আল-ইজাযুল কুরআনি*, মারওয়ান আত-তাফতানাজি, পৃষ্ঠা : ৩৯০-৩৯১।

হতে থাকে—এমনকি প্রলম্বিত হতে হতে সেটা পর্যবেক্ষকের কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে, তখন শব্দের কম্পাঙ্ক কমে আসে।[১৬৩]

এমনিভাবে ডপলার ভেবে দেখেছেন, এই বিষয়টি রশ্মি-তরঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পূর্ণ গতিশীল উৎস থেকে বিচ্ছুরিত আলো যখন পর্যবেক্ষকের চোখে পৌঁছে, সেই আলোর তরঙ্গে পরিবর্তন সূচিত হয়। আলোর উৎসস্থলটি যখন পর্যবেক্ষকের কাছে নড়াচড়া করে, তখন আলোর তরঙ্গ সংকুচিত হয়—অনুধাবিত আলো উঁচু কম্পাঙ্কের দিকে (নীল বর্ণের দিকে) সরে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় 'জাহজাহাতুজ-জারকা' তথা 'ব্লু শিফট বা নীল অপসারণ'। উৎসটি যখন পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে দূরে নড়াচড়া করে, তখন রশ্মি-তরঙ্গ প্রলম্বিত হয়, অনুভবের রশ্মিটি নিচু কম্পাঙ্কের দিকে (লাল বর্ণের দিকে) সরে যায়—এই রূপটিকে রেড শিফট বা লাল অপসারণ বলা হয়।[১৬৪] জ্যোতির্বিদগণ যখন আমাদের ছায়াপথ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত নক্ষত্রপঞ্জি থেকে উৎসারিত রশ্মি নিয়ে গবেষণার জন্য বর্ণালিবীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার আরম্ভ করছিল, তখন এই বিষয়টির গুরুত্ব প্রতিভাত হয়।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ স্লিফার আমাদের ছায়াপথ থেকে দূরে অবস্থিত অন্যান্য ছায়াপথের নক্ষত্রপঞ্জি থেকে উৎসারিত আলো নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ডপলারের থিওরি প্রয়োগ করেন। তার কাছে প্রমাণিত হয়, অধিকাংশ ছায়াপথ নিজ নিজ কক্ষপথে বহাল থেকে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—পরস্পর থেকে খুব দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিদগণ এগুলো নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছেন। (আলোচনা চলছিল—মহাবিশ্ব ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে।)

এবার প্রশ্ন জাগছে, এই গবেষণার (ছায়াপথগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সেগুলোও পরস্পর থেকে খুব দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে) মাধ্যমে কি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের দিকে ইঙ্গিত করা সম্ভব হবে? ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের গবেষণায় জ্যোতির্বিদ স্লিফার এমন চল্লিশটি ছায়াপথ প্রমাণ করতে সফল হয়েছেন, যেগুলো এর কক্ষপথে বহাল থেকে খুব দ্রুত নড়াচড়া করে আমাদের থেকে ও তাদের পরস্পর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল এ বিষয়ে সূক্ষ্ম একটি ফলাফলে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন; যার সারকথা হলো—ছায়াপথগুলো আমাদের থেকে খুব দ্রুত দূরে সরে গেলেও তা ঘটছে পূর্ণ সংগতভাবে। পরবর্তী সময়ে এই গবেষণাটি 'ল

---

[১৬৩] বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই অবস্থাকে ডপলার ইফেক্ট (Doppler Effect) বলা হয়। নিরীক্ষক কর্তৃক সংযোজিত।

[১৬৪] আলো পরিমাপের এই সূত্রকে ফ্রনহফার লাইন (Fraunhofer Line) বলা হয়। নিরীক্ষক কর্তৃক সংযোজিত।

হাবল বা হাবলের সূত্র' নামে খ্যাতি লাভ করে। এই সূত্রভিত্তিক গবেষণা করেই হাবল আরও অনেক ছায়াপথ আবিষ্কার এবং সেগুলো পরস্পর থেকে দূরে যাওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করতে সফল হয়েছেন। গবেষণায় তার সহযোগী ছিলেন মিল্টন হামসন। তিনি হাবলের সাথে মিলে ক্যালিফোর্নিয়ায় উইলসন পাহাড়ে কাজ করেছেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি আলোচনায় তারা এই গবেষণাটি প্রকাশ করেছেন।

ছায়াপথগুলো আমাদের থেকে এবং সেগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়াটা পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করছে, মহাবিশ্ব আক্ষরিক অর্থেই বিস্তৃতি লাভ করছে, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মাঝে হইচই সৃষ্টি করেছে। তারা এই সূত্রের সমর্থক ও উপেক্ষক দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন। তবে, বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ ও মহাশূন্যে জ্যোতির্বিদবিদদের কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা চালানোর মাধ্যমে এ কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে—মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে।[১৬৫]

সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রপঞ্জির রশ্মি নিয়ে গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন শক্তিশালী বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করছে।[১৬৬]

তারা সুদীর্ঘ গবেষণার পর বুঝতে পেরেছেন, বর্ণালি রেখাসমূহ সর্বদা লালিমার দিকেই ধাবিত হয়। আর রশ্মির উৎস যখন জমিনে বিদ্যমান পর্যবেক্ষক থেকে দূরে সরে যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি, রশ্মির কম্পাঙ্ক ক্ষীণ হয়ে আসে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে, বর্ণালি রেখাসমূহ ঝুঁকে পড়া এ কথা প্রমাণ করে—প্রতিটি নক্ষত্র পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, মহাবিশ্ব সাধারণভাবে বিস্তৃত হচ্ছে।

সে সত্তা কতই না মহান, যিনি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এই হাকিকত সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন।[১৬৭]

❁❁❁

জ্ঞানগতের আরেকটি মুজিযা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

> আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। [সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৫]

কেউ কেউ মনে করেন, আয়াতে লৌহ অবতরণের বিষয়টি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এর দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকারার্থে লোহা সৃষ্টি

---

[১৬৫] *আল-ইজাযুল কুরআনি*, মারওয়ান আত-তাফতানাজি, পৃষ্ঠা : ১৮৯-১৯২।
[১৬৬] *নাহনু ওয়াল কাওন*, গোয়েল দোরুনি ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা : ২৪।
[১৬৭] *কিসসাতু নুশুয়িল কাওন*, মুখলিস রঈস ও আলি মুসা, পৃষ্ঠা : ৪১।

করেছেন (আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা বোঝানো হয়নি)। কিন্তু আমরা যদি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নিয়ে ভাবি, তাহলে বুঝতে পারি—লোহাকে শারীরিকভাবেই আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এর দ্বারা কেবল সৃষ্টি করাকে বোঝানো হয়নি। এখান থেকে বুঝতে পারি—কুরআন কারিমের এই আয়াত বৈজ্ঞানিক একটি সূক্ষ্ম মুজিযার আধার। সাম্প্রতিক সময়ের ভৌগলিক আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের পৃথিবীতে বিদ্যমান লোহা পৃথিবীর বাইরের বিশাল নক্ষত্র থেকে এসেছে।

প্রকৃতির ভারী খনিগুলো বড় তারকা থেকেই সৃষ্টি হয়। আমাদের সৌরজগতে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদান অনুপস্থিত, যার সাহায্যে তা লোহা তৈরি করতে পারে; তাই লোহা সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড় তারকারাজির মধ্যেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, যেখানে তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রিতে পৌঁছে যায়। যখন কোনো তারকায় লোহার পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে যায়, তখন আর তারকার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে না—পরিশেষে ছিটকে পড়ে এবং নোভা বা সুপারনোভায় (এমন তারকা, যার জ্যোতি হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, আবার কয়েক মাস বা বছর থাকার পর লোপ পায়।) পরিণত হয়। এই ছিটকে পড়ার ফলে মহাকাশের বিভিন্ন দিগন্তে লোহার মতো উল্কা ছড়িয়ে যায়। এরপর সেগুলো শূন্যে স্থানান্তরিত হয়; সেখান থেকে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের আকর্ষণশক্তি সেগুলোকে আকর্ষণ করে (এরপর সেখান থেকে জমিনে নিক্ষিপ্ত হয়।)। এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়, লোহা জমিন থেকে উত্থিত হয় না, বরং মহাশূন্যীয় তারকাসমূহের বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট উল্কার মাধ্যমে জমিনে নাজিল হয়। আলোচিত আয়াতটি এ কথাই প্রমাণ করে। কুরআন কারিম সপ্তম খ্রিষ্ট শতাব্দীতে এ বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিয়েছিল, যখন বিজ্ঞানজগৎ এ ব্যাপারে ছিল তথ্যশূন্য।[১৬৮]

❁❁❁

অন্য আয়াতে আরেকটি পরিষ্কার মুজিযার কথা উল্লেখ আছে। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

আমি মানুষকে মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি। [সুরা দাহার, আয়াত : ২]

সমস্ত মুফাসসিরগণ একমত, মিশ্র শুক্রবিন্দু হলো—নারী ও পুরুষের বীর্যের মিশ্রণ। দুটি ভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ। কুরআন কারিম অবতীর্ণ হওয়ার দশ শতাব্দী পর অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত কেউ জানত না, গর্ভস্থিত ভ্রূণটি এমন নিষিক্ত ও নিঃসৃত ডিম্বাণু থেকে তাদের জিন বহন করে—যা এমন এক বিন্দু তুচ্ছ পানির মতো, যা মাতা-পিতার বীর্যের সংমিশ্রণে তৈরি হয়—যাকে আমরা বর্তমানে ক্রোমোজম বলে ব্যক্ত করি।

---

[১৬৮] *আল-মুজিযাতুল কুরআনিয়্যাহ*, হারুন ইয়াহইয়া, পৃষ্ঠা : ৩৪।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثَىٰ

হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। [সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩]

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি মানুষকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন। পূর্ববর্তী অনেক মুফাসসির বলেছেন, ভ্রূণ কেবল পুরুষের বীর্য থেকে তৈরি; সেটি মায়ের গর্ভে প্রতিপালিত হয়, সেখানে অবস্থিত রক্ত থেকে তার আহার্যের জোগান হয়। কিন্তু এই আয়াতের আলোকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়, পুরুষ ও নারী উভয়ের বীর্যের মিশ্রণে ভ্রূণ তৈরি হয়। এটা কুরআন কারিমে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত, সুতরাং এখানে ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।[১৬৯]

মানুষের সৃষ্টির স্তরগুলো আরম্ভ হয় পিতার নিকট শুক্রাণু গঠনের মাধ্যমে। মায়ের সমস্ত ডিম্বাণু মৌলিকভাবেই তৈরি থাকে, যা কিনা ভ্রূণের মূল । প্রবাহিত শুক্রাণু বীর্যবিন্দুর সাদৃশ্য লাভ করে। এটাকেই কুরআন কারিম স্পষ্টভাবে বলেছে। ইরশাদ হয়েছে—

وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ۝ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ.

যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানবসৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। [সুরা সাজদাহ, আয়াত : ৭-৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? [সুরা মুরসালাত, আয়াত : ২০]

তবে নিষিক্তকরণের কাজ সম্পাদনের জন্য একটি শুক্রাণু প্রয়োজন, যা পানির ফোঁটাসদৃশ বীর্য থেকে তৈরি হয়। কুরআন কারিম কয়েকটি আয়াতের সমষ্টিতে বিষয়টি এভাবে বলেছেন—

[১৬৯] *আল-জামি লিআহকামিল কুরআন*, ইমাম কুরতুবি, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৩৪২-৩৪৩।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝

মানুষ কি মনে করে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? [সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ৩৬-৩৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ

মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। [সুরা নাহল, আয়াত : ৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

মানুষ কি ভেবে দেখে না, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৭৭]

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—কুরআন কারিম পানিসদৃশ বীর্যের উপাদানের পরিচয় দিতে গিয়ে 'প্রবলবেগে স্খলিত পানি' বলার জন্য কর্তাবাচক শব্দ 'دافق' ব্যবহার করেছে। কর্মবাচক শব্দ 'مدفوق' ব্যবহার করেনি। অথচ তখনো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে বীর্যের এই পরিচয় কেউ প্রদান করেনি। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ

অতএব, মানুষের দেখা উচিত কী বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে; সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। [সুরা তারিক, আয়াত : ৬]

প্রাচীন অণুবীক্ষণের মাধ্যমে দেখা কঠিন হওয়ার কারণে ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ডালি ম্যাথিউস মানুষকে শুক্রাণু-জীবের মূল বলে আখ্যায়িত করেছেন—অর্থাৎ সতেরোশ খ্রিষ্টাব্দের মাত্র এক বছর পূর্বে। তিনি কোনোভাবেই পিতা-মাতা থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির স্তরগুলো বোঝেননি। সপ্তম শতাব্দীতে এসে শুক্রাণু সৃষ্টির ব্যাপারে কুরআন কারিমের স্পষ্ট ঘোষণা আমরা বুঝতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا - وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না, অথচ তিনি তোমাদের বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। [সুরা নুহ, আয়াত : ১৩-১৪]

ভ্রূণ সৃষ্টির প্রথম ধাপটি রেহেমে (জরায়ু) প্রবেশের পূর্বেই পূর্ণতা পায়। আপনি কুরআন কারিমের ভারসাম্যপূর্ণ বর্ণনা দেখলে বিমোহিত হয়ে যাবেন, ভ্রূণের সবগুলো পর্যায়কে আরবি শব্দ 'বুতুন—বাতনুনের বহুবচন'-এর দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে; অর্থাৎ ভ্রূণ প্রাকৃতিকভাবে পেটের অনেকগুলো স্তরের মাঝে অবস্থান করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেটগুলোর মধ্যে এক সৃষ্টির পর আবার সৃষ্টি করে তিনটি আঁধারের মাঝে। [সুরা জুমার, আয়াত : ৬]

বর্তমানে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও প্রমাণিত, ভ্রূণ তিনটি পর্দার মাঝে আবৃত থাকে। কুরআন কারিম স্পষ্টভাবে ধাপগুলোর ভিন্নতার বর্ণনা দিয়েছে—যেগুলোতে ভ্রূণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে। সবগুলো সময়ের আবর্তন ভ্রূণের ওপর বর্তাতে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি; অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি; এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি; অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত্ত করেছি; অবশেষে একে এক নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১২-১৪]

ভ্রূণ রেহেমের প্রথম স্তরে জমাট রক্তের সদৃশ হয়। এই স্তরে প্রকৃতভাবে এর কোনো উপমা পাবেন না। এই স্তরে ভ্রূণটি লম্বাটে, কলবমুক্ত, নার্ভহীন থাকে—এর সাথে ঝুলন্ত শেষাংশ থেকে আহার্য গ্রহণ করে; এটা হলো—রেহেমে ভ্রূণের অবস্থানকালীন প্রথম স্তরের অবস্থা। এরপর শুরু হয় গঠনগত প্রাথমিক অঙ্গগুলোর গড়ন। ভ্রূণ এই স্তরে এসে বাঁকা হতে আরম্ভ করে; এর মাঝে সৃষ্টি হয় উঁচু-নিচু। শরীরের সেসব গঠন প্রকাশ পেতে শুরু করে, যা মেরুদণ্ডের হাড় তৈরি করে—ঠিক যেভাবে মাড়ি বা

গোস্তের টুকরোর মাঝে দাঁতের আলামত প্রকাশ পায়। ভ্রূণটির আয়তন এ পরিমাণ হয় যে, তা চিবানো যায় এবং একটি অবস্থার জানান দেয়; তখন তাকে 'মুজগা বা গোস্তের টুকরো' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। এই স্তরে এসে এই ব্যাখ্যাটিই এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। (chewable mass–like embryo) প্রাথমিক অঙ্গ গড়নের এই স্তরটি সপ্তম সপ্তাহে গিয়ে অস্থি গড়নের সূচনা হয়। অষ্টম সপ্তাহে পেশীসমূহ দ্বারা অস্থিগুলো আবৃত করা হয়। এই স্তরটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর সাথে মিলে যায়—

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا.

> এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি; অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি; এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি; অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিয়েছি। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১৪]

কুরআন কারিমের পূর্বে ওহির সাথে সম্পৃক্ত অন্য কোনো গ্রন্থে এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং বৈজ্ঞানিক কথা বলা হয়নি। অষ্টম সপ্তাহের বিদায়ের সাথে সাথে অঙ্গ গঠনের প্রথম স্তরটি (organogenesis) পূর্ণতা লাভ করে। ষষ্ঠ সপ্তাহের প্রাথমিক গঠন সৃষ্টির পর ভ্রূণ মানুষের আকার ধারণ করে। তখন জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে কেবল বেড়ে ওঠা ও আকৃতির ভারসাম্য, মাথা ও শরীরের সাযুজ্যই বাকি থাকে। এই অবস্থাটা আল্লাহ তাআলার এই বাণীটির সাথে পূর্ণভাবে মিলে যায়—

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

> অবশেষে একে এক নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১৪]

মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এ কথা মেনে নিতে বাধ্য, এ ধরনের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা কুরআন কারিম এত সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে পারা, এ কথার অকাট্য প্রমাণ বহন করে, এর উৎস কোনো মানুষ হতে পারে না। এসব তথ্য উপস্থাপনের জন্য মানুষের প্রয়োজন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং যুগ হতে হবে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগ—যাতে বিজ্ঞানের যেকোনো তথ্য-উপাত্তের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকে—যেমন শেষের তিন শতাব্দী। অথচ কুরআন অবতরণের যুগ না ছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগ, আর না সে যুগে কোনো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল। এজন্যই ইসলামের ব্যাপারে তিরস্কারকারীরা অহংকার, গোঁড়ামি, মূর্খতা আর কুরআন

কারিমের ওহিলব্ধ দলিলাদির অপব্যাখ্যা ছাড়া জ্ঞানগত কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারছে না।[১৭০]

❁❁❁

আমরা যখন কুরআন কারিমের বিজ্ঞানসমৃদ্ধ আয়াতগুলো নিয়ে ভাবি, তখন বুঝতে পারি, তাতে ঝলমলে জাঁকজমকপূর্ণ মুজিযাসমৃদ্ধ ছায়া রয়েছে।

আমরা দুধভাইদের সাথে নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতে বৈজ্ঞানিক মুজিযা নিয়ে ভেবেছি। কুরআন কারিম দুধভাইকে আপন ভাইয়ের সাথে তুলনা করেছে। এই সূত্রেই আপন ভাইয়ের মতো দুধ ভাইয়ের সাথে বিবাহ হারাম করেছে। ইরশাদ হয়েছে—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ أَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْأَخِ وَ بَنٰتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ .

> তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা—যারা তোমাদের স্তন্য পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন। [সুরা নিসা, আয়াত : ২৩]

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, দুগ্ধদাত্রী মায়ের দুধে শরীরের এমন কিছু অংশ থাকে, তিন থেকে পাঁচ ঢোক দুধ পান করার কারণেই দুগ্ধপানকারীর শরীরে অ্যান্টিবডি বা প্রতিরক্ষিকা হল তৈরিতে যে অংশটি অবদান রাখে। ...মানুষের শরীরে অ্যান্টিবডি গঠনে এই কয়েকটি ঢোক প্রত্যাশিত। এমনকি পরীক্ষাগারস্থ যে নবজাতকের রোগ-প্রতিরোধ-ব্যবস্থা পূর্ণরূপে গঠিত হয়নি, যখন তা দুগ্ধ পান করে, তখন তার শরীরেও দুগ্ধদাত্রীর কাছ থেকে রোগ-প্রতিরোধ-সংক্রান্ত কিছু কিছু জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়; ফলশ্রুতিতে দুগ্ধীয় মিরাসসূত্রে তার মাঝে দুধসম্পর্কীয় ভাই বা বোনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—ভাই-বোনের মাঝে যদি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাহলে রোগ প্রতিরোধক কণা-কণিকায় মিল থাকার কারণে নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়।[১৭১]

---

[১৭০] '*ইন্না খালাক্নাল ইনসানা মিন নুত্ফাতিন আমশাজ* শিরোনামের প্রবন্ধ –ডক্টর মুহাম্মদ দাহদুহ। সূত্র : htp:// quran- m.com/firas/arabic/?page=show_der@id=১৭০৪@select_page=২

[১৭১] *তাসিরু লাবানিল উম্মি আলাল আতফাল*, ডক্টর মার্ক সাইরিজান, মাওকিউ জাদিদিল ইলমি—www.sciencealert.com.au/news/২০০৮১১০২-১৬৮৭৯.html

এখান থেকে আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ে কুরআন কারিমের হিকমতের দিকটি খুঁজে পাই—দুগ্ধ সম্পর্কীয় ভাই-বোনের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়া কেন অনিবার্য! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এ ব্যাপারে তৃপ্তিসহ পাঁচ ঢোক দুধ পানের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে; এ হলেই দুধ-সম্পর্কিত সূত্র তৈরি হয়ে যায়।[১৭২]

এই হলো কুরআন কারিমের মুজিযার কিছু দিক, যা প্রমাণ করে—আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন কারিম শব্দ ও অর্থসহ নাজিল করেছেন। আরও প্রমাণ করে—হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমগ্র জগতের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

পশ্চিমা বিশ্বের নিষ্ঠাবান গবেষকগণ স্বীকার করেছেন, কুরআন কারিম চিরস্থায়ী মুজিযা। এদের মধ্যে এমিল ডারমেঙ্গেম অন্যতম। তিনি কুরআন কারিমের ব্যাপারে বলেছেন—প্রতিটি নবির জন্য তাঁর রিসালাতের পক্ষে দলিল প্রয়োজন, অপরিহার্য দরকার এমন কিছু মুজিযার, যার দ্বারা তিনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। কুরআন কারিম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা।

কুরআন কারিমের বিস্ময়কর বর্ণনাপদ্ধতি ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনাশক্তি আজ পর্যন্ত এ শক্তি রাখে, এর তিলাওয়াতকারীকে এ প্রশান্ত করবে—যদি সে ইবাদতকারী মুত্তাকিও না হয়। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা মানব ও দানবজগৎকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন—তারা যেন কুরআন কারিমের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করে দেখায় (না পারলে ছোট্ট একটি সুরা বা আয়াত তৈরি করে দেখায়; কেউ পারেনি। এই চ্যালেঞ্জটি ছিল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সত্যতার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল।[১৭৩]

---

[১৭২] হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, কুরআন কারিমে দশ ঢোক দুধ পানের দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বিধেয় ছিল। তারপর সেটি রহিত হয়ে পাঁচ ঢোক নির্ধারিত হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের পরই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হয়েছে। *সহিহ মুসলিম, কিতাবুর রিজায়ি, বাবুত তাহরিমি বিখামসি রাজায়াতিন* : হাদিস : ১৪৫২

[বি : দ্র : পাঁচ ঢোক দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে, এর কম হলে হারাম হবে না—এটা মুহতারাম গ্রন্থকারের মাজহাবের মতামত। তবে হানাফি মাজহাবের সিদ্ধান্ত হলো—এক ঢোক দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু এর জন্য দুটি শর্ত প্রযোজ্য : ১. অবশ্যই শিশুকে দুগ্ধ পানের বয়সসীমা—দুই থেকে আড়াই বছরের মাঝেই পান করতে হবে। ২. দুধ পেটে পৌঁছুতে হবে; তবে দুধ পান করলেই সতর্কতামূলকভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হারামের ফাতাওয়া প্রদান করা হবে। তাদের প্রমাণ হলো—হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন—عن ابن عباس، قال: « يحرم قليل الرضاع وكثيره » 'অল্প ও বেশি দুগ্ধপান (বৈবাহিক সম্পর্ককে) হারাম করবে।'—*মাশকিলুল আসার*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৭৪, হাদিস : ৩৯৫৯।—অনুবাদক।

[১৭৩] *হায়াতে মুহাম্মদ*, এমিল ডারমেঙ্গেম, পৃষ্ঠা : ২৮৯।

ঐতিহাসিক মুজিযা

বিরোধীদের চ্যালেঞ্জের জবাবে মুমিনদেরকে সাহায্য করার জন্য কুরআন কারিম পূর্ববর্তী উম্মাহর ইতিহাস বর্ণনার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। এমন অনেক মানুষের জীবনী সম্পর্কে দলিলনির্ভর পদ্ধতিতে ও নিতান্ত সূক্ষ্মভাবে সংবাদ দিয়েছে, যারা হাজার হাজার বছর পূর্বে জীবনযাপন করেছে—ঐতিহাসিকরা বস্তুজাগতিক প্রমাণের মাধ্যমে যে পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেন না। কুরআন কারিম পূর্ববর্তী উম্মাহর ইতিহাস উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অভিনবত্বের পথ অবলম্বন করেছে। স্পষ্ট করে দিয়েছে—এসব কাহিনির বর্ণনার পেছনে কেবল সান্ত্বনা ও প্রশান্তি দান উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল তাৎপর্য হচ্ছে দিকপ্লাবী প্রভাব সৃষ্টি করে ব্যাপ্তিশীল মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

> তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়; এটি কোনো মনগড়া কথা নয়। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন, প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১]

ইমাম সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহর আলোচনা অনুপাতে ঐতিহাসিক মুজিযা হলো—অতীত শতাব্দী, প্রাচীন জাতিসমূহ, ঘুর্ণনশীল সংবিধানসমূহ সম্বলিত হওয়া; যেসব ঘটনার ছিটেফোটা বিরল কিছু আহলে কিতাব পণ্ডিত ছাড়া কেউ জানত না, যারা এগুলো শিক্ষা করতে নিজেদের জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এমন ঘটনাগুলোই নবিজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণরূপে বিশুদ্ধভাবে হুবহু বর্ণনা করতেন—অথচ তিনি ছিলেন উম্মি, পড়ালেখা জানতেন না।[১৭৪]

মানুষ তো মানুষই। শত শত শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, একের পর এক বহু প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে, কিন্তু তাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি, পাল্টেনি তাদের প্রকৃতি। এজন্য কুরআন কারিম অতীত জাতির সাথে তাদের কাছে প্রেরিত নবিদের আলোচনাও করেছে। বহু কাল অতীত হওয়ার পর মানুষের সামনে নতুনভাবে তাদেরকে তুলে ধরা হয়েছে, যেন এর দ্বারা অতীতের অনুরূপ সামাজিক ও আত্মিক রোগগুলোর চিকিৎসা করা যায়। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় রোগগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য অনেক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, বহু প্রকার শিক্ষা ও নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সে রোগের জীবাণুগুলোর মূলোৎপাটন করা হয়েছে।[১৭৫]

উদাহরণস্বরূপ আমরা হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনাটি নিয়ে একটু ভেবে দেখব। নিজের জাতির হিদায়াতের জন্য তাঁর দাওয়াতের প্রারম্ভিক যুগ থেকে নিয়ে সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছরের ইতিহাস বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বড় বড় মিথ্যার যেসব পসরা সাজিয়েছিল, সেগুলোও বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে মুমিনদের সংখ্যাস্বল্পতা, জাহাজ নির্মাণ, মুমিনদের তাতে আরোহণ, মহাপ্লাবনের ঘটনা, নবির পুত্র ও স্ত্রীর ডুবে যাওয়ার ঘটনা; এরপর হজরত নুহ এবং তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণকারীদের সামনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার বিষয়সহ—সবকিছু তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিস্তারিত বিবরণ কীভাবে জানলেন, যার কিছু দিক মাত্র আহলে কিতাবদের গ্রন্থগুলোতে বিবৃত হয়েছে, আরও অজস্র দিক উল্লেখই হয়নি! অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন। এজন্য আমাদের রব হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে এভাবে শেষ করেছেন—

تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ .

এটি গায়েবের খবর; আমি আপনার প্রতি ওহি প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার ও আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, সুপরিণাম তাদেরই জন্য। [সুরা হুদ, আয়াত : ৪৯]

---

[১৭৪] *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২৩।
[১৭৫] *নাজরাতুন ফিল কুরআন*, মুহাম্মদ আল-গাজালি, পৃষ্ঠা : ৯৫-৯৮।

এই চিরসত্য ঘটনাটি কুরআন কারিমের অনেকগুলো ঘটনার একটি। যা প্রমাণ করে, কুরআন কারিম এর ঐতিহাসিক প্রামাণ্যে মুজিযা। এর ওপর ভিত্তি করে অনেক মানুষের সভ্যতা ও বিভিন্ন জাতির রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কুরআন কারিমের ঐতিহাসিক মুজিযাগুলোর স্পষ্ট আরেকটি উদাহরণ হলো—ফেরাউনের নামের সাথেই তার নৈকট্যপ্রাপ্ত হামানের মতো লোকের নাম উল্লেখ করা। আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের ভাষায় বলেছেন—

> وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ .
>
> ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না, আমি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য আছে! হে হামান, তুমি ইট পোড়াও; অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি মুসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা হচ্ছে, সে একজন মিথ্যাবাদী। [সুরা কাসাস, আয়াত : ৩৮]

ওল্ড টেস্টামেন্টের[১৭৬] একটি গ্রন্থে হামানের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, কুরআন কারিম ঠিক তার বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছে। সে ইরাকের ব্যবিলিয়ন শহরের বাদশার সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ইসরাইলিদের অনেক বড় ক্ষতি করেছে। অথচ এটি সংঘটিত হয়েছে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রায় এগারোশ বছর পরে। ফেরাউন-কেন্দ্রিক গবেষণা কুরআন কারিমের বর্ণনাকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করেছে। বিভিন্ন গ্রন্থ ও হায়রোগ্লিফ চিত্রলিপি থেকে হামানের গুরুত্বপূর্ণ ও পূর্ণ পরিচয় উদ্ধার হয়েছে; তা হলো—মিশরের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে হামানের নাম সরাসরি উল্লেখ আছে। বর্তমানে ভিয়েনার একটি জাদুঘরে পাথরের ওপরও তার নামটি পাওয়া যায়। *এমনিভাবে মুজামু আসমায়িল আশখাসি ফিল ইমবারাতুরিয়্যাহ—dictionary of personal names of the new empire—নতুন সাম্রাজ্যের ব্যক্তিদের নামের অভিধান* গ্রন্থেও তার নামটি এসেছে। মিশরীয় সমস্ত শিলালিপি ও কাঠলিপির ওপর ভিত্তি করে

---

[১৭৬] ইহুদিদের কুতুবুল মুকাদ্দাস—পবিত্র গ্রন্থসমূহ

এই গ্রন্থটির রচনা শেষ হয়েছে। এ গ্রন্থে হামানের পদের কথা উল্লেখ রয়েছে; সে পাথরকাটা শ্রমিকদের দায়িত্বশীল ছিল।[১৭৭]

❋❋❋

কুরআন কারিমের আরেকটি ঐতিহাসিক মুজিযা হলো—হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগের মিশরের শাসকের জন্য 'মালিক—বাদশা' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ .

বাদশা বলল—আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভি, এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভি খেয়ে যাচ্ছে; সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ, তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৩]

অথচ তাওরাত মিশরের শাসকের জন্য 'ফেরাউন' উপাধিটি ব্যবহার করেছে। কুরআন কারিম ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগের শাসকের ক্ষেত্রে 'ফেরাউন' উপাধিটির ব্যবহার পরিত্যাগের কারণ হলো, সে যুগে মিশরের শাসকের জন্য 'ফেরাউন' উপাধিটির মূল 'বারউ' ব্যবহার করা হতো না, বরং তা 'রাজাপ্রাসাদ ও বাদশা' অর্থে ব্যবহৃত হতো। মিশরের শাসকের জন্য 'ফেরাউন' উপাধিটির ব্যবহার আরম্ভ হয় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের তিরোধানের দুইশ বছর পর থেকে।[১৭৮] হজরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগে মিশরের শাসকদের উপাধি ছিল 'ফেরাউন'। এখান থেকেই কুরআন কারিমের ঐতিহাসিক মুজিযা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম! কেবল হজরত মুসা আলাইহিস সালামের সময়েই মিশরের শাসকের জন্য 'ফেরাউন' উপাধিটি ব্যবহার করেছে কুরআন কারিম, অথচ তাওরাতে হজরত ইবরাহিম, ইউসুফ এবং মুসা আলাইহিমুস সালামের সবার যুগের জন্যই মিশরের শাসকের ক্ষেত্রে

---

[১৭৭] *মুজিযাতুল কুরআনিয়্যাহ*, হারুন ইয়াহইয়া, পৃষ্ঠা : ৭১-৭২।

[১৭৮] উইকিপিডিয়া ব্রিটানিকা বলেছে—'মালিক' উপাধিটি মিশরের সে সকল শাসকের জন্য ব্যবহার করা হতো, যারা খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৪০-১৬৪৮ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় আরোহণ করেছে। অর্থাৎ মিশরে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আগমনের প্রাক্কালে।—*মুকিউ মাওসুআতুল ইজাজিল ইলমিয়্যি ফিল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ,* www.55a.net/firas/arabic

'ফেরাউন' উপাধিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে; কিন্তু মিশরীয়রা হজরত ইবরাহিম ও ইউসুফ আলাইহিমাস সালামের যুগে মিশরের শাসকের জন্য 'ফেরাউন' উপাধিটি ব্যবহার করত না।[১৭৯]

ইমাম ফখরুদ্দি রাজি রাহিমাহুল্লাহর দারুণ একটি উক্তি উল্লেখ করে শিরোনামটির ইতি টানব। তিনি বলেছেন—এই ঘটনাগুলো মুহাম্মদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নবুওয়্যাতের প্রমাণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মি—নিরক্ষর। কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি, কোনো শিক্ষকের হাতে শিষ্যত্বও গ্রহণ করেননি! এমন মানুষ যখন এসব বাস্তব ঘটনা কোনো প্রকার বিকৃতি ছাড়া নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেন, প্রমাণিত হয়, তিনি এসব ওহির মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন—যা তাঁর নবুওয়্যাতের বিশুদ্ধতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।[১৮০]

[১৭৯] *আল-মুজিযাতুল কুরআনিয়্যাহ*, হারুন ইয়াহইয়া, পৃষ্ঠা : ৭৪-৭৫।
[১৮০] *মাফাতিহুল গাইব*, ইমাম রাজি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১৯।

মদিনার সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সঙ্গে নবিজির আচরণ

মদিনায় হিজরত করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার নেতায় পরিণত হন। মদিনার অভ্যন্তরীণ মুশরিক ও ইহুদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁর সাথেই বসবাস করত। যখন ইসলামি রাজত্বের বিস্তৃতি ঘটে, তখন কোনো কোনো অঞ্চলে আগ থেকেই খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুদের অবস্থান ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল এবং সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির চর্চা স্বাধীনভাবেই পালন করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি অবতরণের শুরুর দিকেই ইসলাম এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে—যেন এর মাধ্যমে মনুষ্যত্ব সমুন্নত হতে পারে ও মানুষজন এর ছায়া অবলম্বন করে যেন সুখ অনুভব করতে পারে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতই অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে উত্তম সাক্ষী। ইসলামের শুরুর যুগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের ওপর মক্কাবাসীদের নির্যাতন দেখে, তিনি নিজেও মক্কাবাসীদের নির্যাতন ও নিপীড়নে দগ্ধ হয়ে এবং তাদের নিষ্ঠুরতার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েও তিনি কাফির মুশরিকদের সাথে তাদের অনুরূপ নীতি অবলম্বন করেননি। এমনকি যখন আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও অনুগ্রহে বিজয় লাভ করেন, তখনো তিনি কুরআনের নির্দেশনা মেনে তাদের সাথে এমন আচরণ করেননি এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

তুমি কি ঈমান আনার জন্য মানুষের সাথে জবরদস্তি করবে? [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৯৯]

উক্ত আয়াতে বর্ণিত নীতিকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবায়ন করেছেন এবং মানুষকে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সকল মুসলমানের জন্য এ আয়াতকেই সংবিধান বানিয়েছেন। নিম্নোক্ত আয়াতের শানে নুজুল থেকে এর মর্মার্থ আরও জোরালোভাবে প্রতীয়মান হয়।

আল্লাহ তাআলার বাণী—

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬]

বর্ণিত আছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব থেকেই বনু সালিম ইবনু আউফ গোত্রের একজন আনসারি সাহাবির দুজন খ্রিষ্টান ছেলে ছিল। অতঃপর তারা দুজন খ্রিষ্টানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে তেল নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদিনায় আসেন। বাবা তার দু ছেলেকে দেখে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে—তোমরা মুসলিম না হলে আমি তোমাদেরকে ছাড়ব না। তারা উভয়ে মুসলিম হতে অস্বীকার করে এবং তাদের মাঝে তর্কবিতর্কও শুরু হয়ে যায়। তাদের এ বিবাদের কথা রাসুলের কাছে পৌঁছে যায়। পিতা বলেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার দেহের একটি অংশ [আমার ছেলে] জাহান্নামে যাবে; আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখব, এটা কেমন করে হয়! এমন সময় আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন—

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই।

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে তাদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[১৮১]

দেখতে পেলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খ্রিষ্টান সন্তানের বাবাকে নির্দেশ দিলেন তাদেরকে নিজ আকিদা-বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য, অথচ বাবার অধিকার ছিল সঠিক পথ অবলম্বন করানোর জন্য তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করা। তবুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাদের নিজ আকিদা-বিশ্বাস এবং ইবাদতের স্বাধীনতায় ছেড়ে দিতে বলেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার প্রথম সংবিধানেই প্রত্যেক ধর্মের স্বাধীনতার বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। এর প্রমাণ হচ্ছে—তিনি মদিনার ইহুদিদের জন্য

[১৮১] *আসবাবুন-নুজুল*, ওয়াহিদি আন-নিশাপুরি: ৫৩; *লুবাবুন নুকুল*, সুয়ুতি: ৩৭

মুসলিমদের পাশাপাশি স্বতন্ত্র একটি জাতি এবং সমাজব্যবস্থা গঠনের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[১৮২]

এমনিভাবে তিনি অমুসলিমদের সাথে ন্যায়সংগত ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—আবদুর রহমান ইবনু আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন—কোনো এক সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা একশ ত্রিশজন ছিলাম। একসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—

هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟

তোমাদের কারও সঙ্গে কি খাবার রয়েছে?

দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক সা কিংবা তার কমবেশি পরিমাণ খাদ্য রয়েছে। সেটা দিয়ে আটা গোলানো হলো। অতঃপর দীর্ঘদেহী এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক মুশরিক একটি বকরির পাল হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟

বিক্রি করবে, না উপহার দেবে?[১৮৩]

সে বলল—না, বিক্রি করব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে একটা বকরি কিনে নিলেন। সেটি জবেহ করা হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহর কসম, একশ ত্রিশজনের প্রত্যেককে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কলিজা অল্প অল্প করে সবার হাতে দিলেন; যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের জন্য তুলে রাখলেন। অতঃপর দুটি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেল। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম।[১৮৪]

এই হলো—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ ইনসাফ। যখন একশ ত্রিশজনের একটি দল প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, তখন একজন মুশরিক বকরি নিয়ে যাওয়া অবস্থায়

---

[১৮২] *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, ইবনু কাসির: ২/৩২১; *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ*, ইবনু হিশাম: ১/৫০১; আর-রওজুল উনুফ, সুহাইলি: ২/৩৪৫

[১৮৩] এতে বুঝে আসে তাদের সাথে লেনদেন এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে।—ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি: ৪/৪১০। তবে কিছু কিছু হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

[১৮৪] *সহিহুল বুখারি*: ২৬১৮, ৫৩৮২; *সহিহ মুসলিম*: ২০৫৬

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি ন্যায্য মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন। তাঁর সাথে ছিল পর্যাপ্ত শক্তি এবং প্রয়োজনও ছিল খুব তীব্র। এদিকে লোকটিও ছিল কাফির এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসী। চাইলেই তিনি বিনা মূল্যে জোর করে নিতে পারতেন; তবে তিনি এমনটি করেননি। নিশ্চয়ই এটি ছিল ন্যায়পরায়ণতার সমুন্নত দৃষ্টান্ত।

তিনি তাঁর নিকটতম অমুসলিমদের সাথেও নিজ পরিবারের সদস্যদের ন্যায় আচরণ করতেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—এক ইহুদি বালক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করত, সে একবার অসুস্থ হলে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখার জন্য গেলেন। তিনি বালকটির মাথার নিকট বসে বলেন—

أَسْلِمْ

তুমি মুসলিম হয়ে যাও।

বালকটি তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা তার ছেলেকে বলল—তুমি আবুল কাসিমের[১৮৫] কথা মেনে নাও। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় বললেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।[১৮৬]

এমনকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর অমুসলিম মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছিলেন। (পরবর্তীতে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কুরাইশবাসী চুক্তি করেছিল, তখন আমার মা[১৮৭]—তিনি তখন মুশরিক ছিলেন—তার পিতার সঙ্গে আমার নিকট আসেন। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা[১৮৮] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর

---

[১৮৫] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুনিয়াত তথা উপনাম।

[১৮৬] *সহিহুল বুখারি*: ১৩৫৬; *সুনানুত তিরমিজি*: ২২৪৭

[১৮৭] তিনি হলেন বনি আমের ইবনু লুআই গোত্রের অধিবাসী কুতাইলা বিনতে সাদ। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী। তিনিই আসমা ও আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহুর মা। তিনি অনেক পরে মুসলিম হয়েছেন; হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুশরিক অবস্থায় মদিনায় আগমন করেন। উসদুল গাবা, ইবনুল আসির: ২/২৪২

[১৮৮] তিনি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আসমা। জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে ছিলেন। নবুওয়াতের শুরুর দিকেই তিনি মুসলিম হয়েছেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরকে গর্ভে

রাসুল, আমার মা আমার কাছে এসেছেন; তিনি ইসলামের প্রতি আসক্ত নন। আমি কি তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

نَعَمْ صِلِيهَا

হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।[১৮৯]

এক ইহুদির জানাজা অতিক্রমকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন মানবতার মুগ্ধকর এবং উত্তম দৃষ্টান্ত। আবদুর রহমান ইবনু আবি লাইলা রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত—সাহ্‌ল ইবনু হুনাইফ[১৯০] ও কায়স ইবনু সাদ[১৯১] রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কাদিসিয়াতে উপবিষ্ট ছিলেন; তখন লোকেরা তাদের সামনে দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে যাচ্ছিল। জানাজাটি দেখে তারা দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদেরকে বলা হলো—এ তো এ দেশীয় জিম্মি [অমুসলিম] ব্যক্তির জানাজা। তখন তারা বললেন—একদা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাকে বলা হলো—এটা তো এক ইহুদির জানাজা! তখন তিনি বললেন—

أَلَيْسَتْ نَفْسًا

সে কি মানুষ নয়?[১৯২]

ধারণ অবস্থায় মদিনায় হিজরত করেন। কুবাতে এসে তাঁর গর্ভপাত হয়। জুমাদিউল উলা মাসের ৭৩ হিজরিতে তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর নিহত হবার কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। উসদুল গাবা, ইবনুল আসির: ৬/১২

[১৮৯] *সহিহুল বুখারি:* ২৬২০; *সহিহ মুসলিম:* ১০০৩

[১৯০] সাহল ইবনু হুনাইফ ইবনু ওয়াহিব—তিনি বদর যুদ্ধে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদ যুদ্ধেও তিনি দৃঢ়তার সাথে নিজ ভূমিকায় অটল ছিলেন। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরায় গমনকালে তাকে মদিনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন। সিফফিন যুদ্ধে তিনি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পারস্যের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ৮৮ হিজরিতে কুফায় তিনি ইন্তিকাল করেন।—আল-ইস্তিআব, ইবনু আব্দিল বার: ২/২২৩; উসদুল গাবা, ইবনুল আসির: ২/৩৩৫; আল-ইসাবা, ইবনু হাজর আসকালানি: ৫৩২৩ নং জীবনী।

[১৯১] কায়স ইবনু সাদ ইবনু উবাদা—তিনি আরবের একজন প্রভাবশালী বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ছিলেন একজন দক্ষ সমরকুশলী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর স্থান ছিল তেমন, যেমন থাকে একজন শাসকের কাছে পুলিশ প্রধানের স্থান। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর হাতেই পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই ৫৯ হিজরি অথবা ৬০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। *আল-ইসাবা*, ইবনু হাজার আসকালানি: ৭১৭৬ নং জীবনী; *উসদুল গাবা*, ইবনুল আসির: ২৭২; আল-ইস্তিআব, ইবনু আবদিল বার: ২/২২৩

[১৯২] *সহিহুল বুখারি:* ১৩১৩; *সহিহ মুসলিম:* ৯৬১

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই তাঁর উম্মতকে অমুসলিমদের সম্মান করা শিখিয়েছেন। এমনকি তাদের মৃতদেরকেও সম্মান করতে বলেছেন।

মোটামুটি সংক্ষিপ্তভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সামনে আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেই সমাপ্তি টানব, ইনশাআল্লাহ!

খায়বারের ইহুদিদের সাথে নবিজির উত্তম আচরণ

খায়বারের যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে ইহুদিদের পরাজয়ের পর যখন তারা সন্ধি মেনে নেয়, তখন তারা ছিল দুর্বল অবস্থানে আর মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী অবস্থানে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিমরা চাইলেই পারত তাদের ওপর কোনো বিষয় চাপিয়ে দিতে। কিন্তু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে ভিন্নপন্থা অবলম্বন করে তাদের সাথে সদাচরণ করেছেন এবং উত্তম ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছেন।

সাহল ইবনু আবু হাসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তার গোত্রের কিছু লোক খায়বারে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। যে অধিবাসীদের নিকটে লাশ পাওয়া যায়, তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথিকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করিনি, আর হত্যাকারী কে, তাও জানি না। এরপর তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা খায়বার গিয়েছিলাম আর আমাদের একজনকে সেখানে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। তখন তিনি বললেন—

اَلْكُبْرَ الْكُبْرَ

বড়দেরকে বলতে দাও, বড়দেরকে বলতে দাও।

তারপর তিনি তাদেরকে বললেন—

تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا: لَا
نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ
دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল—আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা কসম করবে। তারা বলল, ইহুদিদের কসমে আমাদের বিশ্বাস নেই। এই

> নিহত ব্যক্তির রক্ত বৃথা হয়ে যাক, তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ উট দিয়ে তার রক্তপণ আদায় করলেন।[১৯৩]

হত্যাকাণ্ডটি যেহেতু ইহুদিদের এলাকায় ঘটেছে, তাই হত্যাকারী তাদের মধ্য থেকেই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। তবুও যেহেতু এ ধারণার কোনো প্রমাণ নেই, আর স্বতঃস্বিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, সন্দেহ ও অনুমানের ভিত্তিতে দাবি কখনো কার্যকর হতে পারে না—এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তিও প্রদান করেননি। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন—তাদেরকে শপথ করতে হবে এই বলে—আমরা এরূপ কাজ করিনি।

শুধু তা-ই নয়, তিনি মুসলিমদের কোষাগার থেকে নিহত ব্যক্তির রক্তপণও পরিশোধ করে দিয়েছেন—যেন আনসারদের ক্ষোভ প্রশমিত হয় এবং ইহুদিদের কোনো ক্ষতি ছাড়াই এই ফিতনা থেমে যায়।

এই ছিল মদিনার অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়নিষ্ঠ ও দয়া এবং অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ।

সমাপ্ত

---

[১৯৩] *সহিহুল বুখারি:* ৬১৪২; *সহিহু মুসলিম:* ১৬৬৯

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমাদের প্রিয়নবি। সাইয়িদুল মুরসালিন। বিশ্ববাসীর জন্য যিনি আদর্শ। আল্লাহ যাঁর ব্যাপারে বলেছেন; হে নবি, আপনি হলে বিশ্ববাসীর জন্য উত্তম আদর্শ।

আমাদের জন্য কী নেই রাসুলের জীবনের মাঝে। ঘর-সংসার, রাজা-গোলাম, ইবাদত-বন্দেগিসহ জীবনের প্রতিটি পর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য রেখে গেছেন উত্তম আদর্শের নমুনা।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নাদবি রাহিমাহুল্লাহ এই গ্রন্থে সে বিষয়টিই তুলে ধরেছেন। তিনি খুবই সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন; নবিজি সাংসারিক জীবনে কেমন ছিলেন; নবিজির দয়া-মহানুভতা কেমন ছিল। নবিজির ইবাদত; অনুগ্রহ; নামাজ-রোজাসহ জীবনের নানা অধ্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী কী আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতিও লেখক এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন সুন্দর ও সহজভাবে। আশা করি বইটি আমাদের জন্য উত্তম পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। ইনশাআল্লাহ।